নেপোলিয়নের চিঠি (গল্প)

(১৯৮১)

ফেলুদা – সত্যজিত রায়

০১. তুমি কি ফেলুদা

তুমি কি ফেলুদা?

প্রশ্নটা এল ফেলুদার কোমরের কাছ থেকে। একটি বছর ছয়েকের ছেলে ফেলুদার পাশেই দাঁড়িয়ে মাথাটাকে চিত করে তার দিকে চেয়ে আছে। এই সে দিনই একটা বাংলা কাগজে ফেলুদার একটা সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে, তার সঙ্গে হাতে চারমিনার নিয়ে একটা ছবি। তার ফলে ফেলুদার চেহারাটা আজকাল রপ্তাঘাটে লোকে ফিল্মস্টারের মতোই চিনে ফেলছে। আমরা এসেছি। পার্ক স্ট্রিট আর রাসেল স্ট্রিটের মোড়ে খেলনা আর লাল মাছের দোকান হবি সেন্টারে। সিধুজ্যাঠার সত্তর বছরের জন্মদিনে তাঁকে একটা ভাল দাবার সেট উপহার দিতে চায় ফেলুদা।

ছেলেটির মাথায় আলতো করে হাত রেখে ফেলুদা বলল, ঠিক ধরেছ তুমি।

আমার পাখিটা কে নিয়েছে বলে দিতে পারো? বেশ একটা চ্যালেঞ্জের সুরে বলল ছেলেটি। ততক্ষণে ফেলুদারই বয়সী এক ভদ্রলোক ব্রাউন কাগজে মোড়া একটা লম্বা প্যাকেট নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছেন, তাঁর মুখে খুশির সঙ্গে একটা অপ্রস্তুত ভাব মেশানো।

তোমার নিজের নামটাও বলে দাও ফেলুদাকে, বললেন ভদ্রলোক।

অনিরুদ্ধ হালদার, গম্ভীর মেজাজে বলল ছেলেটা।

ইনি আপনার খুদে ভক্তদের একজন, বললেন ভদ্রলোক। আপনার সব গল্প ওর মার কাছ থেকে শোনা।

পাখির কথা কী বলছিল?

ও কিছু না, ভদ্রলোক হালকা হেসে বললেন, পাখি পোষার শখ হয়েছিল, তাই ওকে একটা চন্দনা কিনে দিয়েছিলাম। যে দিন আসে সে দিনই কে খাঁচা থেকে পাখিটা বার করে নিয়ে যায়।

খালি একটা পালক পড়ে আছে, বলল ফেলুদার খুদে ভক্ত।

তাই বুঝি?

রাত্তিরে ছিল পাখিটা, সকালবেলা নেই। রহস্য।

তই তো মনে হচ্ছে। তা অনিরুদ্ধ হালদার এই রহস্যের ব্যাপারে কিছু করতে পারেন না?

আমি বুঝি গোয়েন্দা? আমি তো ক্লাস টু-তে পড়ি।

ছেলের বাবা আর বেশিদূর কথা এগোতে দিলেন না।

চলো অনু। আমাদের আবার নিউ মার্কেট যেতে হবে। তুমি বরং ফেলুদাকে এক'দিন আমাদের বাড়িতে আসতে বলো।

ছেলে বাবার অনুরোধ চালান করে দিল। এবার ভদ্রলোক একটা কার্ড বের করে ফেলুদার হাতে দিয়ে বললেন, আমার নাম অমিতাভ হালদার।

ফেলুদা কার্ডটায় একবার চোখ বুলিয়ে বলল, বারাসতে থাকেন দেখছি।

আপনি হয়তো আমার বাবার নাম শুনে থাকতে পারেন। পার্বতীচরণ হালদার।

হ্যাঁ হ্যাঁ! ওঁর লেখা-টেখাও তো পড়েছি। ওঁরই সব নানারকম জিনিসের কালেকশন আছে না?

ওটা বাবার নেশা। ব্যারিস্টারি ছেড়ে এখন ওসবই করেন। সারা পৃথিবী ঘুরেছেন ওই সবের পিছনে। আপনার তো অনেক ব্যাপারে ইয়ে আছে, আমার মনে হয় আপনি দেখলে আনন্দ পাবেন। আদ্যিকালের গ্রামোফোন, মুগল আমলের দাবা বড়ে, ওয়ারেন হেস্টিংসের নাস্যির কোটা, নেপোলিয়নের চিঠি...। তা ছাড়া আমাদের বাড়িটাও খুব ইন্টারেস্টিং।দেড়শো বছরের পুরনো। এক দিন যদি ফ্রি থাকেন, একটা ফোন করে দিলে—রোববার-টাববার...। আমিই বরং একটা ফোন করব। ডাইরেকটরিতে তো আপনার—?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নামেই আছে। এই যে।

ফেলুদাও তার একটা কার্ড ভদ্রলোককে দিয়ে দিল।

কথা হয়ে গেল আমরা এই মাসেই এক দিন বারাসত গিয়ে হাজির হব। লালমোহনবাবুর গাড়ি আছে, যাবার কোনও অসুবিধে নেই। এখানে বলে রাখি, লালমোহনবাবু বহাল তবিয়তে এবং খোশমেজাজে আছেন, কারণ এই পুজোয় জটায়ুর জায়ান্ট অমনিবাস বেরিয়েছে, তাতে বাছাই করা দশটা সেরা রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস। দাম পঁচিশ টাকা এবং লালমোহনবাবুর ভাষায় সেলিং লাইক হট কচুরিজ।

সন্ধ্যাবেলা ফেলুদার মুখ শুকনো দেখে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার। ও বলল, খুদে মক্কেলের আরজিটা মাথায় ঘুরছে রে।

সেই চন্দনার ব্যাপারটা?

খাঁচা থেকে পাখি চুরি যায় শুনেছিস কখনও?

তা শুনিনি সেটা স্বীকার করতেই হল। –তুমি কি এর মধ্যেও রহস্যের গন্ধ পাচ্ছ নাকি?

ব্যাপারটা ঠিক দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে পড়ে না; চন্দনা তো আর বার্ড অফ প্যারাড়াইজ নয়। এক যদি না কারও নেগলিজেন্সে খাঁচার দরজাটা বন্ধ করতে ভুল হয়ে গিয়ে থাকে।

কিন্তু সেটা তো আর জানিবার কোনও উপায় নেই।

তা থাকবে না কেন? ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই জানা যায়। আসলে বুঝতে পারছি এ ব্যাপারটা ও-বাড়ির কেউ সিরিয়াসলি নেয়নি। ঘটনাটা যে অস্বাভাবিক সেটা কারুর মাথায় ঢেকেনি। অথচ ছেলের মনটা যে খচু খচু করছে সেটা বুঝতে পারছি, না হলে আমায় দেখে ও কথাটা বলত না। অন্তত একবার যদি গিয়ে দেখা যেত...

তা ভদ্রলোক তো বললেনই যেতে।

হ্যাঁ-কিন্তু সেটাও হয়তো আমাকে সামনা-সামনি দেখলেন বলে। বাড়ি ফিরে সে কথা আর মনে নাও থাকতে পারে। ছোট ছেলের অনুরোধ বলেই মনে হচ্ছে সেটাকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়।

ক্রিসমাসের যখন আরু পাঁচ দিন বাকি তখনই এক শনিবারের সকালে এসে গোল অমিতাভবাবুর ফোন। আমি কলটা ফেলুদার ঘরে ট্রানসফার করে বসবার ঘরের মেন টেলিফোনে কান লাগিয়ে শুনলাম।

মিঃ মিত্তির?

বলুন কী খবর।

আমার ছেলে তো মাথা খেয়ে ফেলল। কবে আসছেন?

পাখির কোনও সন্ধান পেলেন?

নাঃ–সে আমার পাওয়া যাবে না।

ভয় হয়, আপনার ছেলে যদি ধরে বসে থাকে তার পাখি উদ্ধার করে দেব, তখন সেটা না। পাওয়া গেলে তো বেইজ্জতের ব্যাপার হবে।

সে নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। ছেলেকে খানিকটা সময় দিলেই সে খুশি হয়ে যাবে। আসলে আমার বাবার সঙ্গে একবার আপনার আলাপ করিয়ে দিতে চাই। আজ তো আমার ছুটি; আপনি কী করছেন?

তেমন কিছুই না। আজ দশটা নাগাদ হলে হবে?

নিশ্চয়ই।

শনি রবি দু দিনই আমাদের বাড়িতে সকাল নটায় লালমোহনবাবুর আসাটা একেবারে হাণ্ড্রেড পারসেন্ট শিওর। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আসাটা কলকাতা শহরে। আজকাল আর সম্ভব। নয়, তবে দশ মিনিট এদিক ওদিকের বেশি হয় না কোনও দিনই। আজও হল না। ঠিক নটা বেজে পাঁচ মিনিটে ঘরে ঢুকে ধাপ করে সোফায় বসে পড়ে বললেন, কালি কলম মন, লেখে তিনজন। মশাই, পুজোর লেখার ধাকলের পর শীতকালটা এলে লেখার চিন্তাটা থাউজ্যান্ড মাইলস দূরে চলে যায়—কালি কলম খাতার দিকে আর চাইতেই ইচ্ছা করে না।

লালমোহনবাবু ইদানীং প্রবাদ নিয়ে ভীষণ মেতে উঠেছেন। সাড়ে তিনশো প্রবাদ নাকি উনি মুখস্থ করেছেন। লেখার ফাঁকে ফাঁকে লাগসই প্রবাদ গুঁজে দিতে পারলে সাহিত্যের রস নাকি ঘনীভূত হয়। তিনি অবিশ্যি শুধু লেখায় নয়, কথাতেও যখন-তখন প্রবাদ লাগাচ্ছেন। আজ ভদ্রলোকের পরনে ছাই রঙের টেরিলিনের প্যান্ট আর সবুজ সোয়েটার, আর হাতে এক চাঙাড়ি কচুরি। কচুরির কারণ আর কিছুই না— হাঁট। কচুরির আজকাল আর তেমন ডিমান্ড আছে কি না ফেলুদার এই প্রশ্নের উত্তরে লালমোহনবাবু বলেন, মশাই, বাগবাজারের মোহন ময়রার দোকানে কচুরির জন্য কিউ দেখলে মনে হবে সেখানে কোনও বাম্বাই-মাক হিন্দি হিট ছবি চলছে। আপনাকে খাওয়ালে বুঝবেন উপমাটা কত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট।

সঙ্গে এক ফ্লাস্ক জল আর কচুরির চাঙাড়িটা নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। লালমোহনবাবু পার্ব্বতী হালদারের নাম শোনেননি। তবে নেপোলিয়নের চিঠি শুনে ভয়ানক ইমপ্রেস্ড হলেন। বললেন ইস্কুলে থাকতে ওঁর হিরো নাকি ছিল নেপোলিয়ন।গ্রেট ম্যান, বোনাপাটি কথাটা বার তিনেক চাপা গলায় বললেন যাবার পথে।

ভি আই পি রোডের আগে স্পিড তুলতে পারলেন না লালমোহনবাবুর ড্রাইভার হরিপদবাবু। বারাসতে যখন পৌছিলাম, তখন প্রায় সাড়ে দশটা।

বাড়িটা রাস্তা থেকে চোখে পড়ে না। গেট দিয়ে ঢুকে নুড়ি ফেলা রাস্তায় খানিকটা গিয়ে তবে থামওয়ালা দালানটা দেখা যায়। একেবারে সাহেবি ঢঙের বাড়ি, বয়সের ছাপ যতটা থাকার কথা ততটা নেই; মনে হয় বছরখানেকের মধ্যেই অন্তত সামনের অংশটায় চুনকাম ও রিপেয়ার দুই-ই হয়েছে। বাড়ির সামনে একটা বাঁধানো পুকুরের চারিপাশে সুপুরি গাছের সারি।

অমিতাভবাবু নীচেই অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য, ফেলুদা লালমোহনবাবুর সঙ্গে আলাপ করানোতে বললেন, আমি নিজে আপনার লেখা পড়িনি বটে, তবে আমার স্ত্রী রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের ভীষণ ভক্ত।

আমরা শ্বেত পাথরের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম। পার্বতীবাবুর কালেকশনের জিনিস নাকি সবই দোতলায়।

বাবার আগে আমার পুত্রের সঙ্গে দেখাটা সেরে নিন, বললেন অমিতাভবাবু। বাবার কাছে এখন লোক আছে। উনি বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎগুলো সকালেই করেন।

অ্যাদ্দুরেও লোক এসে উৎপাত করে?

বাবার মতো কিছু কালেক্টর আছেন, তাঁরা প্রায়ই আসেন। তা ছাড়া সম্প্রতি বাবা একজন সেক্রেটারির জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। তার জন্য কিছু লোক দেখা করতে আসছে।

ওনার সেক্রেটারি নেই?

আছে, তবে তিনি দিল্লি চলে যাচ্ছেন সামনের সপ্তাহে একটা ভাল কাজ পেয়ে। লোকটি বেশ কাজের ছিল। আসলে সেক্রেটারির ব্যাপারে বাবার লাক্‌টাই খারাপ। গত দশ বছরে চারটি সেক্রেটারি এল গেল। একটি তো বছরখানেক কাজ করার পর মেনিনজাইটিসে মারা গেলেন। আরেকটি কথা নেই বাতা নেই, সাঁইবাবার ভক্ত হয়ে বিবাগী হয়ে গেলেন। এখন যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে বাবা কথা বলছেন, তাকে সাত বছর আগে তাড়িয়ে দেন। সেও ছিল সেক্রেটারি।

কেন, তাড়ান কেন?

ভদ্রলোক কাজ খুব ভালই করতেন, তবে অসম্ভব কুসংস্কারী। বাবা সেটা একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। একবার ইজিপ্ট থেকে একটা জেড পাথরের মূর্তি আনার পর কলকাতায় এসে বাবার অসুখ করে। সাধনবাবু বাবাকে সিরিয়াসলি বলেন যে, মূর্তিটি যে দেবীর, তাঁর অভিশাপ পড়েছে। বাবার ওপর। এই এক কথাতেই বাবা তাঁকে একরকম ঘাড় ধরে বার করে দেন।

এই সাধনবাবু যদি আবার এসে থাকেন তা হলে তাঁকে খুবই অপটিমিস্টিক বলতে হবে, এবং আপনার বাবাকে অত্যন্ত ক্ষমাশীল বলতে হয়।

আসলে লোকটাকে তাড়িয়ে দেবার পর বাবার একটু অনুশোচনা হয়েছিল! কারণ ভদ্রলোকের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। আর বাবা ওঁকে সার্টিফিকেটও দেননি।

বাড়িটা বাইরে থেকে বিলিতি ধাঁচের হলেও, ভিতরটা বাংলা জমিদারি বাড়ির মতোই। মাঝখানের নাটমন্দিরকে ঘিরে দোতলার বারান্দার এক পাশে সারি সারি ঘর; বৈঠকখানা, আর পার্বতীচরণের স্টাডি বা কাজের ঘর সামনের দিকে, আর ভিতর দিকে সব শেবার ঘর। ফেলুদার খুদে মক্কেল বারান্দায় তার ঘরের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা সেই দিকে এগিয়ে যাব, এমন সময় জুতোর শব্দ শুনে বৈঠকখানার দিকে চেয়ে দেখি, নীল কট পরা হাতে ব্রিফকেসওয়ালা একজন লোক গাঁটগটিয়ে ঘরটা পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল। অমিতাভবাবু বললেন, এই সেই প্রাক্তন সেক্রেটারি সাধনবাবু। ভদ্রলোককে খুব প্রসন্ন বলে মনে হল না।

এই যে আমার পাখির খাঁচা, ফেলুদা তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বলল অনিরুদ্ধ।

আমি তো সেটাই দেখতে এলাম।

খাঁচাটা একটা হুক থেকে ঝুলছে বারান্দায় রেলিং-এর উপরে। ঝকঝকে ভাবটা দেখে বোঝা যায় খাঁচটাও কেনা হয়েছিল পাখির সঙ্গেই। ফেলুদা সেটার দিকে এগিয়ে গেল। দরজাটা এখনও খোলাই রয়েছে।

আপনার বাড়ির কোনও চাকরের পাখিতে অ্যালার্জি আছে বলে জানেন?

অমিতাভ বাবু হেসে উঠলেন।

সেটা ভাববার তো কোনও কারণ দেখি না। আমাদের বাড়ির কোনও চাকরাই কুড়ি বছরের কম পুরনো নয়। তা ছাড়া এক কালে এ বাড়িতে একসঙ্গে দুটো গ্রে প্যারটি ছিল। বাবা নিজেই এনেছিলেন। অনেক দিন ছিল তারপর মারা যায়।

এই ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন কি?

ফেলুদা বেশ কিছুক্ষণ হাত দিয়ে খাঁচাটাকে নেড়ে-চেড়ে প্রশ্নটি করল।

অমিতাভবাবুর সঙ্গে আমরা দুজনও এগিয়ে গেলাম।

ফেলুদা খাঁচার দরজাটার একটা অংশে আঙুল দিয়ে দেখাল।

ছোট্ট একটা লালের ছোপ বলে মনে হচ্ছে? বললেন অমিতাভবাবু। তার মানে কি–?

যা ভাবছেন তাই। ব্লাড।

চন্দনা মার্ডার? বলে উঠলেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদা খাঁচার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, পাখির রক্ত না মানুষের রক্ত সেটা কেমিক্যাল অ্যানালিসিস না করে বোঝা যাবে না। তবে একটা স্ট্রাগল হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অবিশ্যি সেটা তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। এটা বোঝাই যাচ্ছে যে খাঁচার দরজা খোলা রাখার জন্য পাখি পালায়নি; দরজা খুলে পাখিকে বার করে নেওয়া হয়েছে। আপনারা কেথেকে কিনেছিলেন পাখিটা?

নিউ মার্কেট, বলে উঠল। অনিরুদ্ধ।

অমিতাভবাবু বললেন, ‘নিউ মার্কেটের তিনকড়িবাবুর পাখির দোকান খুব পুরনো দোকান। আমাদের জানাশোনা অনেকেই ওখান থেকে পাখি কিনেছে।

অনিরুদ্ধর ইচ্ছা ছিল তার নতুন কেনা খেলনাগুলো আমাদের দেখায়, বিশেষ করে মেশিনগানটা, কিন্তু অমিতাভবাবু বললেন, এঁরা আবার তোমার কাছে আসবেন। তখন তোমার খেলনা দেখবেন, তোমার মা-র সঙ্গে আলাপ করবেন, চা খাবেন—সব হবে। আগে দাদুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, কেমন?

আমরা পার্বতীবাবুর স্টাডির উদ্দেশে রওনা দিলাম।

কিন্তু দাদুর সঙ্গে আর আলাপ হল না। লালমোহনবাবু পরে বলেছিলেন, এক-একটা ঘটনার শক-এর এফেক্ট নাকি সারা জীবন থাকে। এটা সেইরকম একটা ঘটনা।

বৈঠকখানায় ঢুকেই বুঝেছিলাম চারিদিকে দেখবার জিনিস গিজগিজ করছে। সে সব দেখার সময় ঢের আছে মনে করে আমরা এগিয়ে গেলাম। ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পর‍্যাদা দেওয়া সন্টাডির দরজার দিকে।

আসুন বলে অমিতাভবাবু গিয়ে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে। আর ঢোকামাত্র এক অস্ফুট চিৎকার দিয়ে উঠলেন—

বাবা।

ফেলুদার অমিতাভবাবুকে দু হাত দিয়ে ধরতে হল, কারণ ভদ্রলোক প্রায় পড়েই যাচ্ছিলেন।

ততক্ষণে আমরা দুজনেও ঘরে ঢুকেছি।

বিরাট মেহগনি টেবিলের পিছনে একটা রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন। পার্বতীচরণ হালদার। তাঁর মাথাটা চিত, দুটো পাথরের মতো চোখ চেয়ে আছে সিলিং-এর দিকে, হাত দুটো ঝুলে রয়েছে চেয়ারের দুটো হাতলের পাশে।

ফেলুদা এক দৌড়ে চলে গেছে ভদ্রলোকের পাশে। নাভীটা দেখার জন্য হাতটা বাড়িয়ে আমাদের দিকে ফিরে বলল, তোরা দৌড়ে গিয়ে ওই সাধন লোকটাকে আটকা.দারোয়ানকে বল। দরকার হলে বাইরে রাস্তায় দ্যাখ—

আমার সঙ্গে সঙ্গে লালমোহনবাবুও ছুটি দিলেন। মন বলছিল, দশ মিনিট চলে গেছে, সে লোককে আর পাওয়া যাবে না—বিশেষ করে যদি সে খুন করে থাকে।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রায় কোলিশন হয়েছিল। পরে জেনেছিলাম। উনি পার্বতীচরণের বর্তমান সেক্রেটারি হৃষীকেশবাবু। দুজন অচেনা লোককে এইভাবে তড়িঘড়ি নামতে দেখে তিনি কী ভাবলেন সেটা আর তখন ভাবার সময় ছিল না।

বাইরে কেউ নেই, রাস্তায়ও না, কারুর থাকার কথাও নয়। যেটা সবচেয়ে অদ্ভুত লাগল সেটা হল এই যে দারোয়ান জোর গলায় বলল, গত দশ মিনিটের মধ্যে কেউ গেট দিয়ে বাইরে যায়নি। বাবুর কাছে লোক আসবে বলে সে সকাল থেকে ডিউটিতে রয়েছে, তার ভুল হতেই পারে না।

চলো বাগানের দিকটা দেখি, বললেন লালমোহনবাবু, হয়তো কোথাও ঘাপটি মেরে আছে।

তাই করলাম। দক্ষিণের পুকুরের ধার, পশ্চিমের গোলাপ বাগান, কম্পাউন্ড ওয়ালের পাশটা, চাকরীদের ঘরের আশেপাশে, কোথাও বাদ দিলাম না। পাঁচিল টপকানোও সহজ নয়, কারণ প্রায় আট ফুট উঁচু।

হাল ছাড়তে হল।

সাধনবাবু উধাও।

০২. মৃত্যুটা হয়েছে মারার সঙ্গে সঙ্গেই

পার্বতীবাবুকে মাথার উপরের একটা ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত মেরে খুন করা হয়েছে। এঁদের বাড়ির ডাক্তার সৌরীন সোম বললেন, মৃত্যুটা হয়েছে মারার সঙ্গে সঙ্গেই। ভদ্রলোকের রক্তের চাপ ওঠা-নামা করত, হার্টেরও গোলমাল ছিল।

ইতিমধ্যে পুলিশও এসে গেছে। ইন্সপেক্টর হাজরা ফেলুদাকে চেনেন। মোটামুটি খাতিরও করেন। সাধারণ পুলিশের লোক প্রাইভেট ইনভেসটিগেটরকে যে রকম অবজ্ঞার চোখে দেখে, সে রকম নয়। বললেন, আমাদের যা রুটিন কাজ তা করে যাচ্ছি। আমরা, যদি কিছু তথ্য বেরোয় তো আপনাকে জানাব।

ফেলুদা বলল, যে ভারী জিনিসটা দিয়ে খুন করা হয়েছিল সেটা সম্বন্ধে কোনও আইডিয়া করেছেন?

হাজরা বললেন, তেমন তো কিছু দেখছি না। আশেপাশে। খুনি সেই জিনিসটা নিয়েই ভৌগেছে বলে মনে হচ্ছে।

পেপারওয়েট।

পেপারাওয়েট?

একবার আসুন আমার সঙ্গে।

হাজরা ও ফেলুদার পিছন পিছন আমরাও ঢুকলাম ঘরের মধ্যে।

ফেলুদা টেবিলের একটা অংশে আঙুল দিয়ে দেখাল।

সবুজ ফেল্টের উপর মিহি ধুলো জমে আছে। তারই একটা অংশে একটা ধুলোহীন গোল চাকতি। খুব ভাল করে লক্ষ না করলে বোঝা যায় না।

অমিতাভবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলল ফেলুদা, একটা বেশ বড় এবং ভারী ভিক্টোরীয় আমলের কাচের পেপারওয়েট থাকত এই টেবিলের উপর। এখন নেই।

ওয়েল ডান, মিস্টার মিত্তির!

কিন্তু আসল লোক তো বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল বলে মনে হচ্ছে, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল ফেলুদা।

হাজরা বললেন, নাম আর ডেসক্রিপশন যখন পাওয়া গেছে, তখন তাকে খুঁজে বের করতে অসুবিধা হবে না। তা ছাড়া সে তো অ্যাপ্লিকেশন করেছিল; সেটা থেকে থাকলে তো তার ঠিকানাই পাওয়া যাবে। আমার মনে হয়। দারোয়ান সত্যি কথা বলছে না। একটা সময় সে গেটের কাছে ছিল না; তখনই লোকটা পালিয়েছে। মেন ক্লোভের

উপর বাড়ি, হয়তো বেরিয়েই বাস পেয়ে গেছে! অবিশ্যি সে ছাড়াও তো আরও লোক এসেছিল। সকালে। সাধনবাবু আসার ঠিক আগেই আরেকজন ভদ্রলোক এসেছিলেন। খুনটা তিনিও করে থাকতে পারেন।

কিন্তু পার্বতীবাবুকে মৃত দেখলে সাধনবাবু আর থাকবেন কেন?

আপনি তো দেখেছেন ঘরটা; ও তো কিউরিওর দোকান মশাই; একজন লোক যদি অসৎ হয়, ও ঘরে ঢুকে মালিক মৃত দেখলে তো তার পোয়া বারো!

আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন কোনও জিনিস গেছে কি না?

ফেলুদা প্রশ্নটি করল। বর্তমান সেক্রেটারি হৃষীকেশ দত্তকে। ভদ্রলোক দশটার ঠিক আগে বেরিয়েছিলেন পোস্ট আপিসে দুটো জরুরি বিদেশি টেলিগ্রাম করতে। ফেরার পরেই আমাদের সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা হয়।

তা হয়তে পারতে পারি, বললেন হৃষীকেশবাবু। বাইরের যা জিনিস তা মোটামুটি সবই আমার জানা। ভিতরে আলমারিবন্দি জিনিসেরও একটা তালিকা একবার আমাকে দিয়ে করিয়েছিলেন মিঃ হালদার। তার কিছু জিনিস বোধহয় আজ পেস্টনজীকে দেখাবার জন্য বার করেছিলেন। পেস্টনজী আসেন সাড়ে নটায়।

এই পেস্টনজীর সঙ্গে কি আগেই আলাপ ছিল পার্বতীবাবুর?

খুব। প্রায় দশ বছরের আলাপ। মাসে অন্তত দুবার করে আসতেন। উনিও একজন কালেক্টর। মিঃ হালদারের সংগ্রহে একটা চিঠি ছিল, সেটা দেখতেই ভদ্রলোক আসেন।

এটা কি সেই নেপোলিয়নের চিঠি?

হ্যাঁ।

সেটা কি মিঃ হালদার বিক্রি করার কথা ভাবছিলেন?

মোটেই না। পেস্টনজীর খুব লোভ ছিল ওটার উপর। তিনি মোটা টাকা অফার করবেন, আর মিঃ হালদার রিফিউজ করবেন—তাতে পেস্টনজীর মুখের ভাবটা কেমন হবে সেটা দেখেই মিঃ হালদারের আনন্দ। এ ব্যাপারে ওঁর একটা জিদও ছিল। এই চিঠিটা কেনার জন্য একবার এক আমেরিকান দাম চড়াতে চড়াতে বিশ হাজার ডলারে উঠেছিল। মিঃ হালদার ক্রমাগত মাথা নেড়ে গেলেন। সাহেবের মুখ লাল, শেষ পর্যন্ত মুখ খারাপ করতে আরম্ভ করল, আর সমস্ত ব্যাপারটা বসে বসে উপভোগ করলেন মিঃ হালদার। আজও পেস্টনজী গলা চড়াতে শুরু করেছিলেন সেটা আমি বাইরে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম।

কীসের মধ্যে থাকত জিনিসটা?

একটা অ্যালক্যাথিনের খামে।

তা হলে বোধ হয় যায়নি চিঠিটা। কারণ খামটা টেবিলের উপরই রয়েছে। আর তার মধ্যে একটা সাদা ভাঁজ করা কাগজও দেখলাম।

না গেলেই ভাল। ও চিঠির মর্ম সকলে বুঝবে না।

চুরি হয়েছে কি না সেটা এখন জানা যাবে না, কারণ পুলিশ ও ঘরে কাজ করছে; তা ছাড়া পুলিশের ডাক্তার এইমাত্র এসেছেন, তিনি লাশ পরীক্ষা করছেন।

হৃষীকেশবাবু বললেন, আশ্চর্য। যে সময় সাধনবাবু গেলেন, প্রায় সে সময়ই আমি ফিরেছি। অথচ লোকটার সঙ্গে দেখা হল না।

আপনি বেরিয়েছেন কটায়? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

ঠিক দশটা বাজতে পাঁচ। এখান থেকে পাঁচ মিনিট লাগে পোস্টাপিস যেতে। খোলার সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রামগুলো দিতে চেয়েছিলাম।

সে তো পাঁচ মিনিটের কাজ, তা হলে ফিরতে এত দেরি হল কেন?

হৃষীকেশবাবু মাথা নাড়ালেন। —আর বলবেন না মশাই। ঘড়ির ব্যান্ডের খোঁজ করছিলুম স্টেশনারি দোকানগুলোতে। দেখছেন না ডান হাতে ঘড়ি পরেছি। ব্যান্ডটা ঢিলে হয়ে গেছে। বাঁ কবজি আমার ডান কবজির চেয়ে প্রায় আধা ইঞ্চি সরু। ব্যান্ড ঢলঢল করে। কোনও লাভ হল না। সেই নিউ মার্কেট ছাড়া গতি নেই।

ভদ্রলোক ডান হাতে ঘড়ি পরেন সেটা আগেই লক্ষ করেছি।

আপনি এ বাড়িতেই থাকেন? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। অমিতাভবাবু ভিতরে সামলাচ্ছেন, তা ছাড়া উনি নিজেও বেশ ভেঙে পড়েছেন, তাই ফেলুদা হৃষীকেশবাবুর কাছ থেকে যা তথ্য পাওয়া যায় বার করে নিচ্ছে।

হ্যাঁ, এ বাড়িতেই, বললেন হৃষীকেশবাবু, একতলায়। ফ্যামিলি-ট্যামিলি নেই, তাই মিঃ হালদার বললেন। এখানেই থাকতে; ঘরের তো অভাব নেই। সাধনবাবুও শুনেছি। এ বাড়িতেই থাকতেন।

এ কাজ তো ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন। আপনি। ভাল লাগছিল না বুঝি?

প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল মশাই। তা ছাড়া উন্নতির সুযোগ আজকের দিনে কে ছাড়ে বলুন। মিঃ হালদার অবিশ্যি এমপ্লয়ার হিসেবে ভালই ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই আমার।

আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে এর মধ্যে আলাপ হয়েছে, যদিও কথা হয়নি। তিনি হলেন অমিতাভবাবুর ছোট ভাই অচিন্ত্যবাবু। ভদ্রলোক বাড়িতেই ছিলেন, তাই বোধ হয় পুলিশ এখন তাঁকে জেরা করছে। ফেলুদা হৃষীকেশবাবুকেই জিজ্ঞেস করলেন ছোট ভাইয়ের কথা।

অচিন্ত্যবাবু কী করেন?

থিয়েটার।

থিয়েটার?

আমরা তিনজনেই অবাক।

পেশাদারি থিয়েটার? মানে থিয়েটার করেই ওঁর রোজগার?

হৃষীকেশবাবুকে উত্তরটা দিতে যেন বেশ একটু ভাবতে হল। বললেন, এ সব ভেতরের ব্যাপার। আর সত্যি, আমার পক্ষে বলাটা বোধ হয় খুব শোভা পায় না। এ ফ্যামিলিতে থিয়েটার করাটা বেমানান তাতে সন্দেহ নেই, তবে আমার একটা সন্দেহ হয়েছে যে অচিন্তবাবুর মনে একটা বড় রকমের অভিমান ছিল। চার ভাইয়ের মধ্যে উনিই একমাত্র বিলেত যাননি পড়াশুনো করতে। আসলে বড় ফ্যামিলিতে ছোট ভাই অনেক সময় একটু নেগালেকটেড হয়। ওনার ক্ষেত্রে মনে হয় সেটাই হয়েছে। আমার সঙ্গে মাঝে-মধ্যে কথাবার্তা থেকেও সেটাই মনে হয়েছে। চাকরি একটা করিয়ে দিয়েছিলেন মিঃ হালদারাই, কিন্তু অচিন্তবাবু সেটা ছেড়ে দেন। থিয়েটারের শখটা বোধ হয় এমনিতেই ছিল। বারাসতে একটা ড্রামাটিক ক্লাব নিয়ে খুব মেতে ওঠেন, কিন্তু তাতে মন ভরে না। এখন নবরঙ্গমঞ্চে ঘোরাঘুরি করছেন। দু-একটা হিরোর পার্টও নাকি করেছেন। কালিও দেখছিলাম পার্ট মুখস্থ করেছেন।

এবারে ইনস্পেক্টর হাজরা এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। অচিন্ত্যবাবুর জেরা শেষ। তিনি গোমড়া মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। হাজরা বললেন, খুনটা হয়েছে দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে। পেস্টনজী ছিলেন সাড়ে নটা থেকে দশটার কিছু পর অবধি। সাধন দস্তিদার এসেছেন সেয়া দশটায়, গেছেন সাড়ে দশটায়। ছোট ছেলের ঘর থেকে বাইরের ঝরান্দা দিয়ে সোজা বাপের ঘরে যাওয়া যায়। বাড়ির ভেতরের লোক দেখতে পাবে না। দশটা পাঁচ থেকে সোয়া দশটার মধ্যে অচিন্ত্যবাবু বাপের ঘরে এসে থাকতে পারেন। উনি বলছেন। সারা সকাল পার্ট মুখস্থ করেছেন, কেবল সাড়ে দশটা নাগাদ একবার ভাইপো অনিরুদ্ধর ডাক পেয়ে তার কাছে যান। তার খেলার মেশিনগানটা দেখতে। তখনও তিনি বাপের মৃত্যু-সংবাদ পাননি। যাই হাক, মোটামুটি তিন জনেরই মোটিভ ছিল। ছেলের সঙ্গে বাপের বনত না, পেস্টনজী ছিলেন মিঃ হালদারের রাইভ্যাল, আর সাধন দস্তিদারের ছিল পুরনো আক্রোশ। এই হল ব্যাপার। এবার আপনি এসে একটু দেখে বলুন তো কিছু চুরি গেছে কি না।

শেষ অনুরোধটা করা হল হৃষীকেশবাবুকে। ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন স্টাডির দিকে, আমরা তাঁর পিছনে।

ঘরটায় ঢুকে স্বামীকেশবাবু একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। মেক্যানিক্যাল জিনিসে পার্বতীবাবুর খুব শখ ছিল, কারণ বৈঠকখানায় দেখেছি। একটা প্রথম যুগের সিলিন্ডার গ্রামোফোন, আর এ ঘরে দেখছি একটা আদ্যিকালের ম্যাজিক ল্যানটার্ন। তা ছাড়া ছোট ছোট মূর্তি, পাত্র, দোয়াত, কলম, পিস্তল, পুরনো ছবি, ম্যাপ, বই-এ সব তো আছেই। বাইরের জিনিসপত্র দেখে, চাবি দিয়ে আলমারি, বাক্স দেরাজ ইত্যাদি খুলে দেখে অবশেষে হৃষীকেশবাবু জানালেন যে কোনও জিনিস গেছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

ফেলুদা বলল, আপনি অ্যালক্যাথিনের খামটা একবার দেখলেন না?

ওতে তো চিঠিটা রয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।

তবু একবার দেখে নেওয়া উচিত।

হৃষীকেশবাবুকে খামটা খুলে ভেতরের কাগজটা টেনে বার করতে হল। কাগজের রংটা দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল; পুরনো কাগজ কি এত সাদা হয়? ভাঁজ করা কাগজটা খুলে ফেলেই ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন।

এ কী! এঃ তো প্যাড থেকে ছেঁড়া হালদার মশাইয়ের নিজের চিঠির কাগজ।

অর্থাৎ নেপোলিয়নের চিঠি উধাও।

০৩. ফেলুদা বাড়ির কম্পাউন্ডটা ঘুরে দেখল

আরও আধা ঘণ্টা ছিলাম আমরা হালদারবাড়িতে। সেই সময়টা ফেলুদা বাড়ির কম্পাউন্ডটা ঘুরে দেখল। বাগানটা দেখা শেষ করে, কম্পাউন্ড ওয়ালের কোনও অংশ নিচু বা ভাঙা আছে কি না দেখে আমরা পুকুরের কাছে এলাম! ফেলুদার দৃষ্টি মাটির দিকে, জানি ও পায়ের ছাপ খুঁজছে। শুকনো মাটি, পায়ের ছাপের সম্ভাবনা কম, তবে পুকুরের পূর্ব পাড়ে একটা অংশ ফেলুদার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় সে থেমে গেল!

একটা ছোট্ট বুনো ফুলের গাছ যেন কীসের চাপে পিষে গেছে। আর সেটা হয়েছে কিছুক্ষণ আগেই।

ফেলুদা ফুলের আশপাশটা দেখে পুকুরের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এ পুকুর ব্যবহার হয় না, তাই জলটা পানার আবরণে ঢেকে গেছে। আমরা যেখানটা দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে হাত পাঁচেক দূরে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে পান সরে গিয়ে জল বেরিয়ে পড়েছে।

কিছু ফেলা হয়েছে কি জলের মধ্যে? তাই তো মনে হয়।

কিন্তু ফেলুদা এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করল না। যা দেখবার ও দেখে নিয়েছে।

বাড়ি ফেরার সময় লালমোহনবাবু হঠাৎ বললেন, বাগানে একটা চন্দনা দেখলুম বলে মনে হল। একটা পেয়ারা গাছ থেকে উড়ে একটা সজনে গাছে গিয়ে বসল।

সেটা আমাদের বললেন না কেন? ধমকের সুরে বলল ফেলুদা।

কী জানি, যদি বেরিয়ে যায়। টিয়া! দুটো পাখি এত কাছাকাছি। তবে এ পাখিটা কথা বলে।

আপনি শুনলেন কথা?

শুনলুম বইকী। আপনারা তখন বাগানের উলটা দিকে; আমি আরেকটু হলেই একটা তেঁতুলে বিছের উপর পা ফেলেছি, এমন সময় শুনলুম, বাবু, সাবধান। আর মুখ তুলে দেখি পাখি।

পাখি বলল বাবু সাবধান?

তাই তো স্পষ্ট শুনলুম। আপনারা বিশ্বাস করবেন না বলেই বলিনি।

বিশ্বাস করাটা সত্যিই কঠিন, তাই কথা আর এগোল না।

তবে এটা ঠিক যে এ রকম একটা খুন। আর এ রকম চুরির পরেও ফেলুদার মন থেকে চন্দনার ব্যাপারটা যাচ্ছে না। খুনের দু দিন পর, সোমবার সকালে চা খাওয়ার পর ফেলুদার কথায় সেটা বুঝতে পারলাম, ও বলল,

পার্বতীবাবুর খুন। আর নেপোলিয়নের চিঠি চুরি—এই দুটো ঘটনাই গতানুগতিক। কিন্তু আমাকে একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়েছে এই পাখি চুরির ব্যাপারটা।

গতকাল অমিতাভ বাবু ফোন করেছিলেন; ফেলুদা জানিয়ে দিয়েছে যে নেহাত দরকার না। পড়লে এই অবস্থায় ও আর ওঁদের বিরক্ত করবে না, বিশেষ করে পুলিশ যখন তদন্ত চালাচ্ছেই। লালমোহনবাবু বলেছেন সোমবার হলেও আজ একবার আসবেন, কারণ কী ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না হচ্ছে সেটা জানার ওঁর বিশেষ আগ্রহ।

আমি বললাম,পাখির খাঁচার গায়ে রক্তটা পাখির না মানুষের সেটা তো এখনও জানা গেল না।

ওটা যে মানুষের, সেটা অ্যানালিসিস না করেই বলা যায়, বলল ফেলুদা।কেউ যদি পাখিকে খাঁচা থেকে বার করতে যায় তা হলে সেটা সাবধানেই করবে, কিন্তু পাখি ছটফট করতে পারে, খামচাতে পারে, ঠোকুরাতে পারে। অর্থাৎ যে লোকে পাখিটাকে কার করেছে, তার হাতে জখমের চিহ্ন থাকা উচিত।

সে জিনিস ও বাড়ির কারুর হাতে দেখলে?

উঁহু। সেটার দিকে আমি চোখ রেখেছিলাম। বাবু, চাকর কারুর হাতেই দেখিনি। অথচ টাটুকা জখম। অমিতাভবাবু বললেন পার্ক স্ট্রিটে আমাদের সঙ্গে দেখা হবার দু দিন আগে পাখিটা কিনেছিলেন। তার মানে ১৩ ডিসেম্বর। খুনটা হয় ১৯ ডিসেম্বর।..এই পাখির জন্য আমি অন্য ব্যাপারগুলোতে পুরোপুরি মনও দিতে পারছি না।

খুনের সুযোগ কার কার ছিল তার একটা লিস্ট করছিলে না তুমি কাল রাত্তিরে?

শুধু সুযোগ নয়, মোটিভও।

ফেলুদার পাশেই সোফায় পড়েছিল খাতাটা। সে ওটা খুলে বলল, সাধন দস্তিদার সম্বন্ধে নতুন কথা বলার বিশেষ কিছু নেই। রহস্যটা হচ্ছে তার অন্তধানে। এটা সম্ভব হয় একমাত্র যদি দারোয়ান মিথ্যে কথা বলে থাকে। সাধন তাকে ভালরকম ঘুষ দিয়ে থাকলে এটা হতে পারে। সেটা পুলিশে বার করুক। মিথ্যেবাদীকে সত্যি বালানোর রাস্তা তাদের জানা আছে।

দ্বিতীয় সাসপেক্ট–পেস্টনজী। তবে পেস্টনজীর সত্তর বছর বয়স; বুড়ো মানুষের পক্ষে এ খুন সম্ভব কি না সেটা ভাবতে হবে। আঘাতটা করা হয়েছিল রীতিমতো জোরে। অবিশ্যি সত্তরেও অনেকের স্বাস্থ্য দিব্যি ভাল থাকে। সেটা ভদ্রলোককে চাক্ষুষ না দেখা পর্যন্ত বোঝা যাবে না।

তৃতীয়-অচিন্ত হালদার। বাপের উপর ছেলের টান না থাকলেও খুন করার মতো আক্রোশ ছিল কি না সেটা ভাবার কথা। তবে নেপোলিয়নের চিঠি হাতাতে পারলে ওর আর্থিক সমস্যা কিছুটা মিটত ঠিকই। আর কেউ না হাক, পেস্টনজী যে সে চিঠি কিনতে রাজি হতেন, সেটা বোধহয় অনুমান করা যায়। চতুর্থ-

আবার আরও একজন আছে নাকি?

তাকে সাসপেক্ট বলে বলছি না, কিন্তু অমিতাভবাবু সে সময়টা কী করছিলেন, সেটা জানা দরকার বইকী। তাঁর জবানিতে তিনি বলেছেন সকালে তিনি বাগানে থাকেন। ওঁর খুব ফুলের শখ। সে দিন দশটা পর্যন্ত তিনি বাগানে ছিলেন। মাঝে একবার আমাদের ফোন করতে ন'ট্যার সময় তাঁকে নীচের বৈঠকখানায় আসতে হয়, তারপর আমরা আসার আগে আর দোতলায় যাননি। চাকর তাঁকে চা দিয়ে যায় দশটার সময় একতলায় বাগানের দিকের খোলা বারান্দায়। আমাদের গাড়ির আওয়াজ পেয়ে তিনি সামনের দিকে চলে আসেন। দোতলায় যান। তিনি একেবারে আমাদের নিয়ে, তার আগে নয়।

সব শেষে হলেন হৃষীকেশবাবু। ইনি দশটা বাজতে পাঁচে বেরিয়েছেন সেটা দারোয়ান দেখেছে, কিন্তু ফিরতে দেখেছে কি না মনে করতে পারছে না। দারোয়ানের কথাবার্তা খুব রিলায়েবল বলে মনে হয় না। চল্লিশ বছর চাকরি করছে বটে হালদার বাড়িতে, হয়তো এমনিতে বিশ্বস্ত, কিন্তু বয়স হয়েছে সত্তরের উপর, কাজেই স্মরণশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসা অস্বাভাবিক নয়। হৃষীকেশবাবু স্টেশনারি দোকানে অতটা সময় কাটিয়েছেন কি না সেটা জানা দরকার। যদি সে ব্যাপারে মিথ্যেও বলে থাকেন, তার খুনের সুযোগ সম্বন্ধে সন্দেহ থেকেই যায়। একমাত্র নেপোলিয়নের চিঠি হাত করা ছাড়া মোটিভও খুঁজে পাওয়া যায় না।

ফেলুদা খাতাটা বন্ধ করল। আমি বললাম, চাকর-বকিরদের বোধহয় সব কটাকেই বাদ দেওয়া যায়।

শুনিলিই তো চাকর সব কটাই পুরনো। তাদের মধ্যে বেয়ারা মুকুন্দ পার্বতীচরণের ঘরে কফি নিয়ে যায় পেস্টনজী ও পার্বতীবাবুর জন্য। পার্বতীচরণ একা থাকলেও রোজ দশটায় কফি খেতেন। এ ছাড়া আর কোনও চাকর নটার পর পার্ব্বতীচরণের ঘরে যায়নি। বাড়িতে লোক বলতে আর আছে অমিতাভবাবুর স্ত্রী, অনিরুদ্ধ, পার্বতীবাবুর আশি বছরের বুড়ি মা, মালী, মালীর এক ছেলে, ড্রাইভার ও দারোয়ান; অচিন্ত্যবাবু বিয়ে করেননি।

ফেলুদা একটা চারমিনার ধরাবার সঙ্গে সঙ্গেই ফোন বেজে উঠল। ইনস্পেক্টর হাজরা।

কী খবর বলুন স্যার, বলল ফেলুদা।

সাধন দস্তিদারের ঠিকানা পাওয়া গেছে।

ভেতি গুড।

ভেরি ব্যাড, কারণ সে ঠিকানায় ওই নামে কেউ থাকে না।

বটে?

এবং কোনও দিন ছিল ও না।

তা হলে?

তা হলে আর কী–যে তিমিরে সেই তিমিরে। মহা ফিচেল লোক বলে মনে হচ্ছে।

আর হৃষীকেশবাবুর অ্যালিবাই ঠিক আছে?

উনি পোস্টাপিসে গিয়েছিলেন। দশটায় এবং টেলিগ্রামগুলো করেছেন এটা ঠিক। তারপর স্টেশনারি দোকানো যাবার কথা যেটা বললেন, সেটা ভেরিফাই করা গেল না, কারণ দোকানে কেউ মনে করতে পারল না।

আর পেস্টনজী?

অসম্ভব তিরিক্ষি মেজাজের লোক। প্রচণ্ড ধনী। দেড়শো বছর কলকাতায় আছে। এই পার্শি ফ্যামিলি। এমনিতে বেশ শক্ত সমর্থ লোক, তবে কাবু হয়ে আছেন আরথ্রাইটিসে, ডান হাত কাঁধের উপর ওঠে না! ওঁর পক্ষে এই খুন প্রায় ইমপসিবল। লর্ড সিনহা রোডে গিয়ে রোজ সকালে ফিজিওথেরাপি করান। চেক করে দেখেছি; কথাটা সত্যি।

তা হলে তো সাধন দস্তিদারের সন্ধানেই লেগে থাকতে হয়।

আমার ধারণা লোকটা বারাসতেই থাকে, কারণ ওর অ্যাপ্লিকেশনের খামে বারাসতের পোস্টমার্ক রয়েছে।

সে কী, এ তো খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।

আমরা খোঁজ করছি। এখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না। ও, ভাল কথা, খোকার ঘরে চোর এসেছিল।

আবার?

আবার মানে?

হাজরা পাখির কথাটা জানেন না। ফেলুদা সেটা চেপে গিয়ে বলল, না, বলছিলাম-একটা চুরি তো হল বাড়িতে, আবার চোর?

যাই হাক, কিছু নেয়নি।

খোকা টের পেলে কী করে?

সে বাবা-মায়ের পাশের ঘরে এক শোয়। বিলিতি কায়দা আর কী। তা কাল মাঝ রাত্তিরে নাকি খুঁটিখাট শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। ছেলের সাহস আছে। কে বলে চেঁচিয়ে ওঠে, আর তাতেই নাকি চোর পালিয়ে যায়। আমি খোকাকে

জিজ্ঞেস করলুম।–তোমার ভয় করল না? তাতে সে বললে যে বাড়িতে খুন হবার পর থেকে নাকি সে বালিশের তলায় মেশিনগান নিয়ে শোয়, আর সেই কারণেই নাকি তার ভয় নেই।

দশটার সময় লালমোহনবাবু এসে হাজির। ফেলুদাকে গভীর দেখে ভদ্রলোক ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। –সে কী মশাই, আপনি এখনও অন্ধকারে নাকি?

কী করি বলুন—রোজ যদি একটা করে নতুন রহস্যের উদ্ভব হয়, তা হলে ফেলু মিত্তির কী করে?

আবার রহস্য?

খোকার ঘরে চার ঢুকেছিল কাল রাত্তিরে।

বলেন কী? চোরের কি কোনও বাছবিচার নেই? মুড়ি-মিছরি এক দর?

এখন আপনার উপর ভরসা।

হুঁ—চন্দ্র-সূর্য অস্ত গেল, জোনাক ধরে বাতি–ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেল, শল্য হল রখী! তবে হ্যাঁ-চন্দনার ব্যাপারটা কিন্তু আমায় হনটি করছে। ওটা নিয়ে একটা আলাদা তদন্ত করা উচিত। আপনার সময় না থাকলে আমি করতে রাজি আছি। তিনকড়িবাবুর দোকানে আমার খুব যাতায়াত ছিল এককালে।

সে কী, এটা তো বলেননি। আগে।

আরে মশাই, এককালে খুব পাখির শখ ছিল আমার। একটা ময়না ছিল, সেটাকে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম লাইন আবৃত্তি করতে শিখিয়েছিলাম।

জল পড়ে পাতা নড়ে দিয়ে শুরু করা উচিত ছিল আপনার।

ভদ্রলোক ফেলুদার খোঁচটা অগ্রাহ্য করে আমার দিকে ফিরে বললেন, কী হে তপেশীবাবু, যাবে নিউমার্কেট?

ফেলুদা বলল, যেতে হয় তো বেরিয়ে পড়ুন। আমি ঘণ্টাখনেক পরে আপনাদের মিট করব।

কোথায়?

নিউ মার্কেটের মধ্যিখানে, কামানটার পাশে। বিস্তর ঘোরাঘুরি আছে, বাইরে খাওয়া আছে।

সপ্তাহে এক দিন রেস্ট্রর‍্যান্টে খাওয়াটা আমাদের রেগুলার ব্যাপার।

লালমোহনবাবুর গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়লাম।

নিউ মার্কেটের পাখির বাজারের জবাব নেই। তবে তিনকড়িবাবু যে জটায়ুকে চিনবেন না। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ ভদ্রলোক এ দোকানে শেষ এসেছেন সিক্সটি এইটে। লালমোহনবাবু এক গাল হেসে চিনতে পারছেন? জিজ্ঞেস করাতে তিনকড়িবাবু তাঁর মোটা চশমার উপর দিয়ে লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, চেনা মুখ তো ভুলি না চট করে। নাকু বাবু তো? আপনি কারবালা ট্যাঙ্ক রোডে থাকেন না?

লালমোহনবাবুর চুপিসানো ভাব দেখে আমিই কাজের কথাটা পাড়লাম।

আপনার এখান থেকে গত দিন দিশেকের মধ্যে কি কেউ একটা চন্দনা কিনে নিয়ে গেছে? বারাসতের এক ভদ্রলোক?

বারাসতে কিনা জানি না, তবে দুখানা চন্দনা বিক্রি হয়েছে দিন দশোকের মধ্যে। একটা নিল জয়শক্তি ফিলিম কোম্পানির নেপেনবাবু। বলল চিন্ময়ী মা না মৃন্ময়ী মা কী একটা বইয়ের শুটিং-এ লাগবে। ভাড়ায় চাইছিল—আমি বললুম। সে দিন আর নেই। নিলে ক্যাশ দিয়ে নিয়ে যান, কাজ হয়ে গেলে পর আপনাদের হিরোইনকে দিয়ে দেবেন।

আর অন্যটা যে বেচলেন, সেটা কেথেকে এসেছিল। আপনার দোকানে মনে আছে?

কেন মশাই, অন্ত ইনফরমেশনে কী দরকার?

ভদ্রলোক একটু সন্দিগ্ধ বলে মনে হল।

সেই পাখিটা খাঁচা থেকে চুরি গেছে অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে, বললেন লালমোহনবাবু, সেটা ফিরে পাওয়া দরকার;

ফিরে পেতে চান তো কাগজে অ্যাডভারটাইজ দিন।

তা না হয় দেব, কিন্তু আপনার দোকানে কেখেকে এসেছিল সেটা–

অতশত বলতে পারব না। আপনি অ্যাডভারটাইজ দিন।

পাখিটা কথা বলত কি?

তা বলবে না কেন? তবে কী বলত জিজ্ঞেস করবেন না। সতেরোটা টকিং বার্ড আছে আমার দোকানে। কেউ বলে গুড মর্নিং, কেউ বলে ঠাকুর ভাত দাও, কেউ বলে জয় গুরু, কেউ বলে রাধাকেষ্ট-কোনটা কোন পাখি বলে সেটা ফস করে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারব না।

আধা ঘণ্টা সময় ছিল হাতে, তার মধ্যে লালমোহনবাবু একটা নখ কাটার ক্লিপ, আধা ডজন। দেশবন্ধু মিলসের গেঞ্জি আর একটা সিগন্যাল টুথপেস্ট কিনলেন। তারপর চীনে জুতোর দোকানে গিয়ে একটা মোকসিনের দাম

করতে করতে আমাদের অ্যাপায়স্টমেন্টের সময় এসে গেল! আমরা কামানের কাছে যাবার তিন মিনিটের মধ্যেই ফেলুদা হাজির।

এবার কোথায় যাওয়া? মার্কেট থেকে বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলেন লালমোহনবাবু।

বলেন কী? সেই সিরাজদ্দৌলার অ্যামল থেকে?

সেই রকম একটি প্রাচীন পাশি বাড়িতে এখন যাব আমরা। ঠিকানা হচ্ছে।–ফেলুদা পকেট থেকে খাতা বার করল

একশো তেত্রিশের দই বৌবাজার স্ট্রিট।

০৪. বৌবাজার স্ট্রিট

একশো তেত্রিশের দুই বৌবাজার স্ট্রিট দেড়শো বছরের পুরনো বাড়ি কি না জানি না। তবে এত পুরনো বাড়িতে এর আগে আমি কখনও যাইনি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দুটো দোকানের মাঝখানে একটা খিলেনের মধ্যে দিয়ে প্যাসেজ পেরিয়ে কাঠের সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় গিয়ে ডান দিকে ঘুরে সামনেই দরজার উপর পিতলের ফলকে লেখা আর. ডি. পেস্টনজী। কলিং বেল টিপতেই একজন বেয়ারা এসে দরজা খুলল। ফেলুদা তার হাতে তার নিজের নাম আর পেশা লেখা একটা কার্ড দিয়ে দিল।

মিনিট তিনেক পর বেয়ারা এসে বলল, পাঁচ মিনিটের বেশি সময় দিতে পারবেন না বাবু।

তাই সই। আমরা তিনজন বেয়ারার সঙ্গে গিয়ে একটা ঘরে ঢুকলাম।

বিশাল অন্ধকার বৈঠকখানা, তারই এক পাশে দেওয়ালের সামনে সোফায় বসে আছেন। ভদ্রলোক। সামনে টেবিলে রাখা বোতলে পানীয় ও গেলাস। গায়ের রং ফ্যাকাসে। নাকটা টিয়া পাখির মতো ব্যাকা, চওড়া কপাল জুড়ে মেচেতা।

সোনার চশমার মধ্যে দিয়ে ঘোলাটে চোখে আমাদের দিকে চেয়ে কর্কশ গলায় বললেন, বাট ইউ আর নট ওয়ান ম্যান, ইউ আর এ ক্রাউড।

ফেলুদা ক্ষমা চেয়ে ইংরাজিতে বুঝিয়ে দিল যে তিনজন হলেও, সে একই কথা বলবে; বাকি দুজনকে ভদ্রলোক অনায়াসে অগ্রাহ্য করতে পারেন।

ওয়েল, হায়াট ডু ইউ ওয়ন্ট?

আপনি পাৰ্ব্বতী হালদারকে চিনতেন বোধহয়?

মাই গড, এগেন?

ফেলুদা হাত তুলে ভদ্রলোককে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে বলল, আমি পুলিশের লোক নই সেটা আমার কার্ড দেখেই নিশ্চয় বুঝেছেন। তবে ঘটনাচক্রে আমি এই খুনের তদন্তে জড়িয়ে পড়েছি; আমি শুধু জানতে চাইছিলাম-এই যে নেপোলিয়নের চিঠিটা চুরি হয়েছে, সেটা সম্বন্ধে আপনার কী মত।

পেস্টনজী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তুমি দেখেছি চিঠিটা?

ফেলুদা বলল, কী করে দেখব, যে দিন ভদ্রলোকের মৃত্যু, সে দিনেই তো আমি প্রথম গেলাম তার বাড়িতে।

পেস্টনজী বললেন, নেপোলিয়নের বিষয় পড়েছি তো তুমি?

তা কিছু পড়েছি।

ফেলুদা গত দু দিনে নেপোলিয়ন সম্বন্ধে আর পুরনো আর্টিস্টিক জিনিস সম্বন্ধে সিধু জ্যাঠার কাছ থেকে বেশ কিছু বই ধার করে এনে পড়েছে সেটা আমি জানি।

সেন্ট হেলেনায় তার শেষ নিবাসনের কথা জানো তো?

তা জানি।

কোন সালে সেটা হয়েছিল মনে আছে?

১৮১৫।

ভদ্রলোকের ঠোঁটের কোণে হাসি দেখে বুঝলাম তিনি ইমপ্রেসড হয়েছেন। বললেন, এই চিঠি লেখা হয়েছিল ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে। সেন্ট হেলেনায় যে ছ। বছর বেঁচেছিলেন। নেপোলিয়ন, সেই সময়টা তাঁকে চিঠি লিখতে দেওয়া হয়নি। তার মানে এই চিঠিটা তাঁর শেষ চিঠিগুলির মধ্যে একটা। কাকে লেখা সেটা জানা যায়নি—শুধু মশেরামী-অর্থাৎ আমার প্রিয় বন্ধু। চিঠির ভাব ও ভাষা অপূর্ব। সব হারিয়েছেন তিনি, কিন্তু এই অবস্থাতেও তিনি এক বিন্দু আদর্শচ্যুত হননি। এ চিঠি লাখে এক। জুরিখ শহরে এক সর্বস্বান্ত মাতালের কাছ থেকে জলের দরে এ চিঠি কিনেছিলেন পার্ব্বতী হালদার। আর সে জিনিস আমার হাতে চলে আসত মাত্র বিশ হাজার টাকায়।

কী রকম?-আমরা সকলেই অবাক-মাত্র বিশ হাজার টাকায় এ চিঠি আপনাকে বিক্রি করতে রাজি ছিলেন। মিঃ হালদার?

পেস্টনজী মাথা নাড়লেন। -নো নো। হি ডিড নট ওয়ন্ট টু সেল ইট। হালদারের গোঁ ছিল সাংঘাতিক। ওঁর এদিকটা আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম।

তা হলে?

পেস্টনজী গেলাসটা তুলে মুখে খানিকটা পানীয় ঢেলে বললেন, তোমাদের কিছু অফগর করতে পারি? চা, বিয়ার-?

না না, আমরা এখুনি উঠব।

ব্যাপারটা আর কিছুই না বললেন পেস্টনজী, এটা পুলিশকে বলিনি। ওদের জেরার ঠেলায় আমার ব্লাড প্রেশার চড়িয়ে দিয়েছিল সাংঘাতিকভাবে। ইউ লুক লাইক এ জেন্টলম্যান, তাই তোমাকে বলছি। কাল সকালে একটা বেনামি টেলিফোন আসে। লোকটা সরাসরি আমায় জিজ্ঞেস করে, আমি বিশ হাজার টাকায় নেপোলিয়নের চিঠিটা কিনতে রাজি আছি কি না। আমি তাকে গতকাল রাত্রে আসতে বলি। সে বলে সে নিজে আসবে না, লোক পাঠিয়ে

দেবে, আমি যেন তার হাতে টাকাটা দিই। সে এও বলে যে, আমি যদি পুলিশে খবর দিই তা হলে আমারও দশা হবে পার্ব্বতী হালদারের মতো।

এসেছিল সে লোক?—আমরা তিনজনেই যাকে বলে উদ্‌গ্রীব, উৎকর্ণ।

পেস্টনজী মাথা নাড়লেন। —নো। নোবাড়ি কেম।

আমরা তখনই উঠে পড়তাম, কিন্তু ফেলুদার হঠাৎ পেস্টনজীর পিছনের তাকের উপর রাখা একটা জিনিসের দিকে দৃষ্টি গেছে।

ওটা মিং যুগের পোর্সিলেন বলে মনে হচ্ছে?

ভদ্রলোকের দৃষ্টি উদ্ভাসিত।

বাঃ, তুমি তো এ সব জানাটানা দেখছি। এক্সকুইজিট জিনিস।

একবার যদি...

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। হাতে নিয়ে না দেখলে বুঝতে পারবে না।

ভদ্রলোক উঠে গিয়ে জিনিসটার দিকে হাত বাড়িয়েই 'আউচ!' বলে যন্ত্রণায় কুঁচকে গেলেন।

কী হল? ফেলুদা গভীর উৎকণ্ঠার সুরে বলল।

আর বোলো না! বুড়ো বয়সের যত বিদঘুটে ব্যারাম। আরথ্রিইটিস। হাতটা কাঁধের উপর তুলতেই পারি না।

শেষকালে ফেলুদা নিজেই এগিয়ে গিয়ে তাক থেকে চীনেমাটির পাত্রটা নামিয়ে নিয়ে হাতে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে বার দু-এক সুপার্ব বলে আবার যথাস্থানে রেখে দিল।

ভদ্রলোকের সত্যিই হাত ওঠে কি না সেটা যাচাই করা দরকার ছিল, রাস্তায় এসে বলল ফেলুদা।

ধন্যি মশাই আপনার মস্তিষ্ক! বলুন, এবার কোনদিকে?

বলতে সংকোচ হচ্ছে। এবার একেবারে কর্নওয়ালিস স্ট্রিট।

কেন, সংকোচের কী আছে?

যা দাম হয়েছে আজকাল পেট্রোলের।

আরে মশাই, দাম তো সব কিছুরই বেশি। আমার যে বই ছিল পাঁচ টাকা, সেটা এখন এইটি রুপিজ। অথচ সেল একেবারে স্টেডি। আপনি ওসব সংকোচ-টংকোচের কথা বলবেন না।

কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের নতুন থিয়েটার নবরঙ্গমঞ্চে গিয়ে হাজির হলাম। প্রোপ্রাইটারের নাম অভিলাষ পোদ্দার। ফেলুদা কার্ড পাঠাতেই তৎক্ষণাৎ আমাদের ডাক পড়ল। দোতলার আপিস ঘরে ঢুকলাম গিয়ে।

আসুন আসুন, কী সৌভাগ্য আমার, স্বনামধন্য লোকের পায়ের ধুলো পড়ল। এই গরিবের ঘরে!

নাদুস-নুদুস বার্নিশ করা চেহারাটার সঙ্গে এই বাড়িয়ে কথা বলাটা বেশ মানানসই। হাতে সোনার ঘড়ি, ঠোঁট দুটো টুকটুকে লাল—এই সবে এক খিলি পান পুরেছেন মুখে, গা থেকে ভুরভুরে আতরের গন্ধ।

ফেলুদা লালমোহনবাবুকে আলাপ করিয়ে দিল গ্রেট থ্রিলার রাইটার বলে।

বটে? বললেন পোদ্দারমশাই।

একটা হিন্দি ফিল্ম হয়ে গেছে আমার গল্প থেকে, বললেন জটায়ু। বোম্বাইয়ের বোম্বেটে। নাটকও হয়েছে একটা গল্প থেকে। গড়পারের রিক্রিয়েশন ক্লাব করেছিল। সেভেনটি এইটে।

ফেলুদা বলল, আপনার জায়ান্ট অমনিবাস একটা পাঠিয়ে দেবেন না মিস্টার পোদ্দারকে।

সার্টেনলি, সার্টেনলি, বললেন মিঃ পোদার। আমি নিজে অবিশ্যি বই-টই পড়ি না, তবে আমার মাইনে করা লোক আছে। তারা পড়ে ও পিনিয়ন দেয়। আমাকে। তা বলুন মিঃ মিত্তির, আপনার কী কাজে লাগতে পারি।

আপনাদের একটি হিরো সম্বন্ধে ইনফরমেশন চাই।

হিরো? মানস ব্যানার্জি?

অচিন্ত্য হালদার।

অচিন্ত্য হালদার? কই সে রকম নামে তো—ও হে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই নামে একটি ছেলে ঘোরাঘুরি করছে বটে। একটা বইয়ে একটা পার্টও করেছিল। চেহারা মোটামুটি ভাল, তবে ভয়েসে গণ্ডগোল। বরং সিনেমা লাইনে কিছু হতে পারে। আমি সেই কথাই বলেছি তাকে। ইন ফ্যাক্ট, ছেলেটি আমাকে টাকা অফার করেছে।

মানে? হিরোর পার্ট পাবার জন্য?

আপনি আকাশ থেকে পড়লেন যে! এ রকম হয় মিঃ মিত্তির।

আপনি আমল দেননি?

নো মিঃ মিত্তির। আমাদের নতুন কোম্পানি, এ সব ব্যাপার খুব রিস্কি! এ প্রস্তাবে রাজি হবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ইয়ে-চা, কফি?

নো, থ্যাঙ্কস।

আমরা উঠে পড়লাম। দেড়টা বাজে, পেটে বেশ চন্‌চনে খিদে। রয়েল হোটেলে খাবারের অড়ার দিয়ে ফেলুদা চন্দনা চুরির ব্যাপারে একটা বিজ্ঞাপনের খসড়া করে ফেলল। ওর চেনা আছে। খবরের কাগজের আপিসে; সম্ভব হলে কালকে না। হয় লেটেস্ট পরশু কাগজে বেরিয়ে যাবে। গত দশ দিনের মধ্যে নিউ মার্কেটে তিনকড়িবাবুর দোকানো কেউ যদি একটা চন্দনা বিক্রি করে থাকেন, তা হলে তিনি যেন নিম্নলিখিত ঠিকানায়, ইত্যাদি।

বিরিয়ানি খেতে খেতে একটা নলী হাড় কামড় দিয়ে ভেঙে ম্যারো-টা মুখে পুরে ফেলুদা বলল, রহস্য যে রকম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় বলা মুশকিল।

দাঁড়ান দাঁড়ান, দেখি গেস্‌ করতে পারি কি না, বললেন লালমোহনবাবু, এই নতুন রহস্য হচ্ছে–সেই লোক চিঠি নিয়ে আসবে বলে এল না কেন, এই তো?

ঠিক ধরেছেন। আমার মতে এর মানে একটাই। সে লোক চিঠিটা পাবে বলে আশা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পায়নি।

আমি বললাম, তার মানে যে চুরি করেছে সে নয়, অন্য লোক।

তাই তো মনে হচ্ছে।

ওরেব্বাস, বললেন লালমোহনবাবু, তার মানে তো একজন ক্রিমিন্যাল বাড়ল।

আচ্ছা ফেলুদা-এ প্রশ্নটা কি দিন থেকেই আমার মাথায় ঘুরছে–পেপারওয়েট দিয়ে মাথায় মারলে লোক মরকেই এমন কোনও গ্যারান্টি আছে কি?

গুড কোয়েশেচনা, বলল ফেলুদা। উত্তর হচ্ছে, না নেই। তবে এ ক্ষেত্রে যে মেরেছে তার হয়তো ধারণা ছিল মরবোই।

কিংবা অজ্ঞান করে জিনিসটা নিতে চেয়েছিল; মারে যাবে ভাবেনি।

রয়েলের খাওয়া যে ব্রেন টনিকের কাজ করে, সেটা তো জানতাম না; তুই ঠিক বলেছিস তোপ্‌সে। সেটাও একটা পসিবল ব্যাপার। কিন্তু সেগুলো জানলেও যে এ ব্যাপারে খুব হেলপ হচ্ছে তা তো নয়। যে লোকটাকে দরকার সে এমন আশ্চর্য ভাবে গা ঢাকা দিয়েছে যে, ঘটনাটা প্রায় অসম্ভবের পযর্নয়ে পড়ে।

অবিশ্যি ভ্যানিশ যে করেনি। সে লোক সেটা সন্ধেবোলা জানতে পারলাম, আর সেটা ঘটল বেশ নাটকীয় ভাবে।

সেটা বলার আগে জানানো দরকার যে সাড়ে চারটের সময় হাজরা ফোন করে জানালেন। বারাসতে সাধন দস্তিদারের কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

লালমোহনবাবু হোটেল থেকে আর বাড়ি ফেরেননি। আমাদের পীছে দিয়ে আমাদের এখানেই রয়ে গিয়েছিলেন। সাড়ে সাতটার সময় শ্রীনাথ আমাদের কফি এনে দিয়েছে, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। শীতকালের সন্ধে, পাড়াটা এর মধ্যেই নিঝুম, তাই বেলের শব্দে বেশ চমকে উঠেছিলাম।

দরজা খুলে আরও এক চমক।

এসেছেন হৃষীকেশবাবু।

কিছু মনে করবেন না-অসময়ে খবর না দিয়ে এসে পড়লাম-আমাদের টেলিফোনটা ফাঁকা পাওয়া যাচ্ছে না। মিঃ হালদারের মৃত্যুর পর থেকেই...

শ্রীনাথকে বলতে হয় না, সে নতুন লোকের গলা পেয়েই আরেক কাপ কফি দিয়ে গেল।

ফেলুদা বলল, আপনাকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে। বসে ঠাণ্ডা হয়ে কী ঘটনা বলুন। হৃষীকেশবাবু কফিতে একটা চুমুক দিয়ে দম নিয়ে বললেন, আপনি আমার একতলার ঘরটা দেখেননি, তবে আমি বলতে পারি ও ঘরটায় থাকতে বেশ সাহসের দরকার হয়। অত। বড় বাড়ির একতলায় আমি একমাত্র বাসিন্দা। চাকরীদের আলাদা কোয়ার্টারস আছে। এ ক বছরে অভ্যোস খানিকটা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পুরোপুরি হয় না। সন্ধে থেকে গাটা কেমন ছমছম করে। যাই হাক, কাল রাত্তিরে, তখন সাড়ে দশটা হবে, আমি খাওয়া সেরে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে মশারিটা ফেলেছি। সবে, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। সত্যি বলতে কী, নক্‌ করার লোক ও বাড়িতে কেউ নেই। যারা আমাকে চায় তারা বাইরে থেকে হাঁক দেয়—এমন কী চাকর-বাকরিও। কাজেই বুঝতে পারছেন, আমার মনে বেশ একটু খটুকী লাগল। খোলার আগে জিজ্ঞেস করলুম, কে? উত্তরের বদলে আবার টাকা পড়ল। একবার ভাবলুম খুলব না। কিন্তু সারারাত যদি ওই ভাবে খট্‌খট্‌ চলে তা হলে তো আরও গণ্ডগোল। তাই কোনওরকমে সাহস সঞ্চয় করে যা থাকে কপালে করে দরজাটা খুললুম; খোলামাত্র একটি লোক ঢুকে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তখনও মুখ দেখিনি; তারপর আমার দিকে ফিরতে চাপ-দাড়ি দেখে আন্দাজ করলুম কে। ভদ্রলোক আমাকে কোনও কথা বলতে না দিয়ে সোজা গড়গড় করে তাঁর কথা বলে গেলেন এবং যতক্ষণ বললেন ততক্ষণ তাঁর ডান হাতে একটি ছোরা সোজা আমার দিয়ে পয়েন্ট করা।

বর্ণনা শুনে আমারই ভয় করছিল। লালমোহনবাবুর দেখলাম মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

কী বললেন সাধন দস্তিদার? প্রশ্ন করল ফেলুদা।

সাংঘাতিক কথা, বললেন হৃষীকেশবাবু। মিঃ হালদারের কালেকশনে কী জিনিস আছে তা যেমন মোটামুটি আমি জানি, তেমনি ইনিও জানেন। বললেন বাহাদুর শা-র যে পান্না বসানো সোনার জন্দার কৌটোটা মিঃ হালদারের সংগ্রহে রয়েছে, সেটার একজন ভাল খদ্দের পাওয়া গেছে, সেটা তার চাই। আমি যেন আজ রাত্তিরে এগারেটার সময় মধুমুরলীর দিঘির ধারে ভাঙা নীলকুঠির পাশে শ্যাওড়া গাছটার নীচে ওয়েট করি—ও এসে নিয়ে যাবে।

এই যে কাজটা করতে বলেছে তার জন্য আপনার পারিশ্রমিক কী?

কচু পোড়া। এ তো হুমকির ব্যাপার। বললে যদি পুলিশে খবর দিই, তা হলে নিঘাত মৃত্যু।

রাত্তিরে দারোয়ান গেটে থাকে না?

থাকে বইকী, কিন্তু আমার ধারণা হয়েছে লোকটা পাঁচিল টপকে আসে।

আপনার ঘর চিনল কী করে?

সাধু দস্তিদারও তো ওই ঘরেই থাকত-চিনবে না কেন?

ভদ্রলোকের ডাক নাম সাধু ছিল বুঝি?

মিঃ হালদারকে তো সেই নামই বলতে শুনেছি।

আপনি তাকে কী বললেন? জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

আমি বললুম, এখন মিঃ হালদারের জিনিসপত্রে কড়া পাহারা, সে কৌটো আমি নেব কী করে? সে বললে, চেষ্টা করলেই পারবে। তুমি মিঃ হালদারের সেক্রেটারি ছিলে; জরুরি কাগজপত্র দেখার জন্য তোমার সে ঘরে ঢোকার সম্পূর্ণ অধিকার আছে; ব্যস্—এই বলেই সে চলে গেল। আমি জানি, আপনি ছি ছিা করবেন, বলবেন পুলিশে খবর দেওয়া উচিত ছিল, অন্তত বাড়ির লোককে জানানো উচিত ছিল। কিন্তু প্রাণের ভয়ের মতো ভয় আর কী আছে বলুন। আপনার কথাটাই মনে হল। আপনিও যে তদন্ত করছেন সেটা আমার মনে হয় সাধু জানে না।

আপনি তা হলে কৌটো বার করেননি।

আপনি কি প্রস্তাব করছেন যে, আমরা সেখানে যাই? আপনারা যদি একটু আগে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকেন-আমি গেলাম এগারোটায়-তারপর সে এলে যা করার দরকার সে তো আপনিই ভাল বুঝবেন। এইভাবে হাতেনাতে লোকটাকে ধরার সুযোগ তো আর পাবেন না।

পুলিশকে খবর দেব না বলছেন?

অমন সর্বনাশের কথা উচ্চারণ করবেন না, দোহাই। আপনি আসুন, সঙ্গে এঁদেরও নিতে পারেন। তবে সশস্ত্র অবস্থায় যাবেন, কারণ লোকটা ডেঞ্জারাস।

লেগে পড়ুন, বিনা দ্বিধায় বললেন লালমোহনবাবু।রাজস্থানের ডাকাত যখন আমাদের পেছু হটাতে পারেনি, তখন এর জন্য কী ভয়? এ তো নাস্যি মশাই।

আমি অবিশ্যি জায়গাটা দেখিয়ে দেব, বললেন হৃষীকেশবাবু; মেন রোড় ছেড়ে খানিকটা ভেতর দিকে যেতে হয়; স্টেশন থেকে মাইল চারেক।

ফেলুদ রাজি হয়ে গেল। হৃষীকেশবাবু কফি শেষ করে উঠে পড়ে বললেন, দশটা নাগাদ তা হলে আপনারা মিট করছেন আমাকে।

কোথায়?

আমাদের বাড়ি ছড়িয়ে দু ফার্লিং গেলেই একটা তেমাথার মোড় পাবেন। সেখানে দেখবেন একটা মিষ্টির দোকান। সেই দোকানের সামনে থাকব। আমি।

০৫. রাত্রে বিশেষ ট্রাফিক নেই

রাত্রে বিশেষ ট্রাফিক নেই, তাও এক ঘণ্টা হাতে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। খাওয়াটা বাড়িতেই সেরে নিলাম। এত তাড়াতাড়ি খাওয়া অভ্যোস নেই। আমাদের; লালমোহনবাবু বললেন, খিদে পেলে ওই মিষ্টির দাকানে ঢুকে পড়া যাবে। কচুরি আর আলুর তরকারি নিঘাত পাওয়া যাবে।

একটা সুবিধে এই যে লালমোহনবাবুর ড্রাইভার হরিপদবাবু ফেলুদার ভীষণ ভক্ত। তার উপর বোম্বাই মার্কা ফাইটিং-এর ছবি দেখার সুযোগ ছাড়েন না। কখনও। এ রকম না হলে রাস্তবিরেতে বারাসতে ঠ্যাঙতে অনেক ড্রাইভারই গজগজ করত; ইনি যেন নতুন লাইফ পেলেন।

ভি আই পি রোডে পড়ে লালমোহনবাবু গান ধরেছিলেন–জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে, কিন্তু ফেলুদা তাঁর দিকে চাইতে অমাবস্যায় গানটা বেমানান হচ্ছে বুঝতে পেরে থেমে গেলেন।

আকাশে এক টুকরো মেঘ নেই। তারার আলো বলে একটা জিনিস আছে, সেটা হয়তো আমাদের কিছুটা হেল্প করতে পারে। ফেলুদার ফরমাশ অনুযায়ী গাঢ় রঙের জামা পরেছি। লালমোহনবাবুর পুলোভারটা ছিল হলদে, তাই তার উপর ফেলুদার রেনকোটটা চাপিয়ে নিয়েছেন। ভদ্রলোক এখন গাড়িতে বক্স; যখন হাঁটবেন তখন একটা পকেট ভীষণ ঝুলে থাকবে, কারণ তাতে ভরা আছে একটা হামানদিস্তার লোহার ভাণ্ডা; ওয়েপন হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ভদ্রলোক ওটা চেয়ে নিয়েছেন শ্রীনাথের কাছে। ফেলুদার পকেটে অবশ্য রয়েছে তার কোল্ট রিভলভার।

আমাদের আন্দাজ ভুল হয়নি; দশটার কিছু আগে আমরা তেমাথায় পৌঁছে গেলাম। মিষ্টির দোকানের পাশেই একটা পানের দোকান—তার সামনে থেকে হৃষীকেশবাবু এগিয়ে এসে আমাদের গাড়িতে উঠে। হরিপদবাবুকে বললেন, ডাইনের রাস্তাটা নিন।

খানিক দূর যেতেই বাড়ি কমে এল। আলোও বেশি নেই; রাস্তায় যা আলো ছিল তাও ফুরিয়ে গেল বাঁয়ে মোড় নিতে। বুঝলাম এটা প্রায় পল্লীগ্রাম অঞ্চল।বারাসতেই ছিল প্রথম নীলকুঠি। বললেন হৃষীকেশবাবু। এ দিকটাতে এককালে অনেক সাহেব থাকত; দিনের আলোয় তাদের সব ভাঙা বাগানবাড়ি দেখতে পেতেন।

মিনিট কুড়ি চলার পর একটা জায়গায় এসে গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন হৃষীকেশবাবু।

আসুন।

গাড়ি থেকে নামলাম চার জনে।গাড়িটা এখানেই ওয়েট করুক, বললেন হৃষীকেশবাবু, আমি আপনাদের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে আসি, তারপরে এই গাড়িই আমাকে বাড়ি পৌঁছে আসব।

লালমোহনবাবু, হরিপদবাবুকে টাকা দিয়ে বললেন, তুমি এঁকে পৌঁছে দিয়ে ফেরার সময় কোনও দোকান-টোকান থেকে খাওয়াটা সেরে নিও। ফিরতে রাত হবে। আমাদের।

ঘাসের উপর দিয়ে মিনিট পাঁচেক হাঁটতে একটা জংলা জায়গা এসে পড়ল।

এখানেই ছিল মধুমুরলীর দিঘি, বললেন হৃষীকেশবাবু। আমাদের যেতে হবে ওখানটায়।

খুবই কম আলো, কিন্তু তাও বুঝতে পারছি যে গাছপালা ছাড়াও ও দিকে একটা দালানের ভগ্নস্তূপ রয়েছে। শীতকাল বলে রক্ষে, না হলে এ জায়গাটা হত সাপ ব্যাঙের ডিপো!

এখন টর্চের আলোটা বোধহয় তেমন বিপজ্জনক কিছু নয়, বলল ফেলুদা।

মনে তো হয় না, বললেন হৃষীকেশীবাবু।

ছোট্ট পকেট টর্চের আলোতে ঝোপঝাড় খানাখন্দ বাঁচিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম নীলকুঠির ভগ্নস্তূপের পাশে।

ওই যে দেখুন। শ্যাওড়া গাছ, বললেন হৃষীকেশবাবু! ফেলুদা সে দিকে একবার টর্চ ফেলে সেটা নিবিয়ে পকেটে পুরল।

আমি তা হলে আসি।

আসুন।

তিন কোয়াটার আপনাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে।

আমরা যে দিক দিয়ে এসেছিলাম। সে দিক দিয়েই চলে গেলেন হৃষীকেশবাবু; এক মিনিটের মধ্যেই তাঁর পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

ওডোমাসটা লাগিয়ে নিন।

ফেলুদা পকেট থেকে টিউব বার করে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে দিল।

যা বলেছেন মশাই। ম্যালেরিয়া শুনছি। আবার খুব বেড়েছে।

আমরা তিন জনেই ওডোমস লাগিয়ে নিয়ে একটা বড় রকম দম নিয়ে অপেক্ষার জন্য তৈরি হলাম। আমাদের কাউকেই দাঁড়াতে হবে না, কারণ ভগ্নস্তূপে নানান হাইটের ইটের পাঁজা রয়েছে, তাতে চেয়ার চৌকি মোড়া সব কিছুবই কাজ হয়? কথা বলতে হলে ফিসফিস্ ছাড়া গতি নেই, তাও প্রথম দিকটায়। পরের দিকে কমপ্লিট মীনী। অন্ধকারে চোখ সয়ে গেছে, এখন চারিদিকে চাইলে বট, অশ্বথ, আমগাছ, বাঁশঝাড়—এসব বেশ তফাত করা যায়।

ঝিঝির শব্দ ছাড়াও যে অন্য শব্দ আছে সেটা বেশ বুঝতে পারছি। ট্রেনের আওয়াজ, সাইকেল রিকশার চড়া হর্ন, রাস্তার কুকুরের ঘেউ ঘেউ, এমন কী দূরের কোনও বাড়ি থেকে ট্রানজিস্টারের গান পর্যন্ত। ফেলুদার ঘড়িতে রেডিয়াম ডায়াল, তাই অন্ধকারেও টাইম দেখতে পারে।

শীত যেন মিনিটে মিনিটে বাড়ছে। শহরের চেয়ে নিঘাত পাঁচ-সাত ডিগ্রি কম। লালমোহনবাবু তাঁর টুপি আনেননি, রুমাল সাদা, তাই সেটা বাঁধলেও চলে না; নিরুপায় হয়ে দুহাতের তেলো দিয়ে টাক ঢেকেছেন। একবার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ করাতে ফেলুদা বলল, কিছু বললেন? তাতে ভদ্রলোক ফিসফিস করে জবাব দিলেন, শ্যাওড়া গাছেই বোধহয় পেত্ত্বি না। শাঁকচুন্নি কী যেন থাকে।

শ্যাওড়া গাছের নামই শুনেছি, ফিসফিসিয়ে বলল ফেলুদা, চোখে এই প্রথম দেখলাম।

আকাশে তারাগুলো সরছে। একটু আগে একটা তারাকে দেখেছিলাম নারকেল গাছের মাথার উপরে, এখন দেখছি গাছটায় ঢাকা পড়ে গেছে। কোনও চেনা কনস্টেলেশন আছে। কি না দেখার জন্য মাথাটা উপর দিকে তুলেছি, এমন সময় একটা শব্দ কানে এল। পায়ের শব্দ।

এগারোটা বাজেনি এখনও। ফেলুদা দু মিনিট আগে ঘড়ি দেখে ফিসফিস করে বলেছে, পৌনে।

আমরা পাথরের মতো স্থির।

যে দিক দিয়ে এসেছি, সে দিক দিয়েই আসছে শব্দটা। ঘাসের উপর মাঝে মাঝে ইট-পাটকেল রয়েছে, তার জন্যই শব্দ। তাও কান না পাতালে, আর অন্য শব্দ না কমলে শোনা যায় না। এখন বিপ্লবিষ্ণুর ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

এবার লোকটাকে দেখা গেল। সে এগিয়ে এসেছে শ্যাওড়া গাছটাকে লক্ষ্য করে।

এবারে তার হাঁটার গতি কমল। আমরা মাটিতে ঘাপটি মেরে বসা, সামনে একটা ভাঙা পাঁচিল আমাদের শরীরের নীচের অংশটা ঢেকে রেখেছে। আমরা তার উপর দিয়ে দেখছি।

হৃষীকেশবাবু—

লোকটা চাপা গলায় ডাক দিয়েছে। হাঁটা থামিয়ে। তাঁর দৃষ্টি যে শ্যাওড়া গাছটার দিকে সেটা মাথাটা দেখে আন্দাজ করতে পারছি, যদিও মানুষ চেনার কোনও প্রশ্ন ওঠে না।

হৃষীকেশবাবু—

ফেলুদা ওঠার জন্য তৈরি। তার শরীর টান সেটা বেশ বুঝতে পারছি।

লোকটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে শুরু করল।

লালমোহনবাবুর ডান কনুইটা উচিয়ে উঠেছে। উনি পকেট হাতড়াচ্ছেন হামানদিস্তার ভাণ্ডাটার জন্য।

লোকটা এখন দশ হাতের মধ্যে।

হৃষীকেশ—

ফেলুদা বাঘের মতো লাফিয়ে উঠতেই একটা রক্ত জল করা ব্যাপার ঘটে গেল।

আমাদের পিছন থেকে দুটো লোক এসে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

ফেলুদার সঙ্গে থেকেই বোধহয় আমার নার্ভ ও শক্ত হয়ে গেছে। চট করে বিপদে মাথা গুলোয় না। আমি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়লাম সামনের দিকে! ফেলুদার ঘুঁষি খেয়ে একটা লোক আমারই দিকে ছিটকে এসেছিল। আমি তাকে লক্ষ্য করে আরেকটা ঘুঁষি

চালাতে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ঘাসের উপর।

কিন্তু এ কী, আরও লোক এসে পড়েছে। পিছন থেকে! তার মধ্যে একটা আমায় জাপটে ধরেছে, আরও দুটো গিয়ে আক্রমণ করেছে ফেলুদাকে। ধস্তাধস্তির শব্দ পাচ্ছি। কিন্তু আমি নিজে বন্দি, যদিও তারই মধ্যে জুতো পরা ডান পা-টা দিয়ে ক্রমাগত পিছন দিকে লাথি চালাচ্ছি।

লালমোহনবাবু কী করছেন এই চিন্তাটা মাথায় আসতেই থুতনিতে একটা বিরাশি শিক্কা ঘা খেলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের অন্ধকার যেন আরও দশ গুণ গাঢ় হয়ে গেল।

তারপর আর কিছু জানি না।

কীরে, ঠিক হ্যায়?

ফেলুদার চেহারাটাই প্রথম দেখতে পেলাম জ্ঞান হয়ে।

ঘাবড়াসনি, আমিও নক-আউট হয়ে গোসলাম দশ মিনিটের জন্য।

এবারে দেখলাম ঘরের অন্য লোকেদের। অমিতাভবাবু তাঁর পাশে একজন মহিলা-নিশ্চয়ই তাঁর স্ত্রী—লালমোহনবাবু, হৃষীকেশবাবু, আর দরজার মুখে দাঁড়িয়ে অচিন্ত্যবাবু। এ ঘরটা আগে দেখিনি; বাড়ির বত্রিশটা ঘরের কোনও একটা হবে।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। একটা কনকনে ব্যথা থুতনির কাছটায়। তা ছাড়া আর কোনও কষ্ট নেই। ফেলুদা ঘুষিটা খেয়েছিল ডান চোখের নীচে সেটা কালসিটে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ব্ল্যাক-আই ব্যাপারটা অনেক বিদেশি ছবিতে দেখেছি; স্বচক্ষে এই প্রথম দেখলাম।

একমাত্র জটায়ুই অক্ষত, বলল ফেলুদা।

সে কী। আশ্চর্য ব্যাপার তো?–কী করে হল?

মোক্ষম ওয়েপন ওই হামানদিস্তা, বললেন লালমোহনবাবু, হাতে নিয়ে মাথার উপর তুলে হেলিকপটারের মতো বই বাই করে ঘুরিয়ে গেলাম। আমার ধারে কাছেও এগোয়নি। একটি গুণ্ডাও।

ওরা গুণ্ডা ছিল বুঝি? হায়ার্ড গুণ্ডাজ, বললেন লালমোহনবাবু।

বললাম লোকটা ডেঞ্জারাস, বললেন হৃষীকেশবাবু। তবে ও যে এতটা করবে তা ভাবিনি। আমি তো গিয়ে অবাক। একজন শোয়া একজন বসা একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে মাটিতে। আর আসল যে লোক সে হাওয়া।

ফেলুদা আর লালমোহনবাবু নাকি আমাকে ধরাধরি করে গাড়িতে এনে তোলেন। অমিতাভবাবু নিজে বেশ রাত অবধি পড়েন, তাই উনি জেগে ছিলেন। যে ঘরটায় আমরা রয়েছি সেটা একতলার একটা গেস্ট রুম। বেশ বড় ঘর, পাশেই বাথরুম। পুবে জানালা দিয়ে নাকি বাগান দেখা যায়। অমিতাভবাবুই জোর করলেন আজ রাতটা এখানে থাকার জন্য। অসুবিধা এই যে বাড়তি কাপড় নেই, যা পরে আছি তাই পরেই শুতে হবে। হৃষীকেশবাবুর ভয়ের জন্যই এই গোলমালটা হল, বললেন অমিতাভবাবু, পুলিশকে বলা থাকলে সাধু সমেত গুণ্ডারা এতক্ষণে হাজতে।

হৃষীকেশবাবুও অবিশ্যি অ্যাপলজাইজ করলেন। কিন্তু ভদ্রলোককেই বা দোষ দেওয়া যায় কী করে? ও রকম শাসনির পর যে কোনও মানুষেরই ভয় হতে পারে।

অমিতাভবাবুর স্ত্রীই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বললেন, বাড়িতে এই দুর্যোগ, আপনাদের সঙ্গে বসে দু দণ্ড কথা বলারও সুযোগ হল না। এনার এত বই আমি পড়েছি।–কী যে আনন্দ পাই তা বলতে পারি না।

শেষের কথাটা অবিশ্যি লালমোহনবাবুকে উদ্দেশ করে বলা।

ফেলুদা বলল, কাল সকালে যাবার আগে আপনার ছেলের সঙ্গে একবার কথা বলে নেব। ঘরে চোর ঢোকার পরেও ও যা সাহস দেখিয়েছে তেমন সচরাচর দেখা যায় না।

সাড়ে বারোটা নাগাদ যখন আমরা শোবার আয়োজন করছি তখন ফেলুদা একটা কথা বলল।

ঘুঁষিটাও যে ব্রেন টনিকের কাজ করে সেটা আজ প্রথম জানলাম।

কী রকম? বললেন লালমোহনবাবু।

সাধুবাবু ভ্যানিশ করার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি এতদিনে।

বলেন কী!

তুখোড় লোক। তবে যার সঙ্গে মোকাবিলা করছে, সেও তো কম তুখোড় নয়।

এর বেশি আর কিছু বলল না ফেলুদা।

০৬. এ বি সি ডি – এশিয়া’জ বেস্ট ক্রাইম ডিটেক্টর

অনিরুদ্ধ সকালে স্কুলে যায়, তাই চা খাবার আগেই ফেলুদা ওর সঙ্গে দেখা করে নিল।

চোর ঢোকারর কথাটা আজ শুনে মনে হল ছেলেটি বেশি রকম কল্পনাপ্রবণ; পরপর দুবার; একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হল। ফেলুদা বলল, তুমি যে বন্দুকটা দিয়ে চোরকে মারবে ঠিক করেছিলে সেটা তো আমাকে দেখালে না। শুনলাম তোমার ছোটকাকাকে দেখিয়েছ।

অনিরুদ্ধ বন্দুকটা বার করে ফেলুদার হাতে দিয়ে বলল, এটা থেকে আগুনের ফুলকি বেরোয়।

লাল প্লাস্টিকের তৈরি মেশিনগান, ট্রিগার টিপলে মেশিনগানের মতো শব্দের সঙ্গে নলের মুখ দিয়ে সত্যিই স্পার্ক বেরোয়।

ফেলুদা বন্দুকটা নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখে সেটার খুব তারিফ করে ফেরত দিয়ে বলল, তোমার যে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে, দেখা যাক সেটা বন্ধ করা যায় কি না।

তুমি চোর ধরে দেবে?

গোয়েন্দার তো ওই কাজ।

আর আমার চন্দনা যে চুরি করেছে সেই চোর?

সেটারও চেষ্টা চলেছে, তবে কাজটা খুব সহজ নয়।

খুব শক্ত?

খুব শক্ত।

দারুণ রহস্য?

দারুণ রহস্য।

আর সে দিন যে বললে, খাঁচার দরজায় রক্ত লেগে আছে?

ওটাই তো ভরসা। ওটাই তো ক্লু।

ক্লু মানে?

কু হল যার সাহায্যে গোয়েন্দা দুষ্ট লোককে জব্দ করে।

লালমোহনবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, তোমার পাখিকে কথা বলতে শুনেছ?

হ্যাঁ, বলল অনিরুদ্ধ। আমি ঘরে ছিলাম, আর শুনলাম পাখিটা কথা বলছে।

কী কথা?

বলছে : দাদু ভাত খান, দাদু ভাত খান। আমি তক্ষুনি বেরিয়ে এলাম। কিন্তু তারপর আর কিছু বলল না।

লালমোহনবাবুর মুখে হাসি। অনিরুদ্ধ শুনেছে, দাদু ভাত খান আর লালমোহনবাবু শুনেছেন, বাবু সাবধান! মানতেই হয় দুটো খুব কাছাকাছি। পাখি নিশ্চয়ই ওই ধরনেরই কিছু বলছিল।

আপনার এখানে পাখি ধরতে পারে এমন কেউ আছে? ফেলুদা অমিতাভবাবুকে জিজ্ঞেস করল।

আমাদের মালীর ছেলে আছে, শঙ্কর, বললেন অমিতাভবাবু। এর আগে দু-একবার ধরেছে পাখি। খুব চালাক-চতুর ছেলে।

তাকে বলবেন একটু চোখ রাখতে। খুব সম্ভব চন্দনাটি আপনাদের বাগানেই রয়েছে।

বারাসতে থাকতেই দেখেছিলাম যে, খবরের কাগজে চন্দনার বিষয় বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে। সেটার কাজ যে এত তাড়াতাড়ি হবে তা ভাবতে পারিনি।

বারোটা নাগাদ একটি বছর পাঁচিশের ছেলে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। বেশ চোখাচোখা চেহারা, পরনে জিনস আর মাথার চুলের কপাল-ঢাকা কায়দা দেখলেই বোঝা যায় ইনি হাল-ফ্যাশানের তরুন।

ফেলুদা বসতে বলতে ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, বাসব না। আজ একটা ইন্টারভিউ আছে। ইয়ে, আমি আসছি। ওই পাখির ব্যাপারে কাগজে যে বিজ্ঞাপনটা দিয়েছেন সেইটে দেখে।

ওটা আপনাদের পাখি ছিল?

আমাদের মানে আমার দাদুর। দাদু মারা গেছেন। লাস্ট মানুথ। তাই বাবা ওটাকে বেচে দিলেন। ওটার দেখাশুনা দাদুই করতেন। বাবা কোর্ট-কাচারি করেন, মা বাতে ভোগেন, আর আমার ও সবে ইন্টারেস্ট নেই।

কদ্দিন ছিল আপনাদের বাড়ি?

তা বছর দশেক। দাদুর খুব পিয়ারের চন্দনা ছিল।

কথা বলত?

হ্যাঁ। দাদুই শিখিয়েছিলেন। খুব রসিক মানুষ ছিলেন। অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শিখিয়েছিলেন।

অদ্ভুত মানে?

এই যেমন—দাদুর পাশার নেশা ছিল; পাখিটাকে শিখিয়েছিলেন 'কচে বারো' বলতে। তারপর ব্রিজও খেলতেন দাদু। খেলার সময় অপোনেন্টের তাস ভাল বুঝতে পারলে পার্টনারকে একটা কথা খুব বলতেন। সেটা পাখিটা তুলে নিয়েছিল।

কী কথা?

সাধু সাবধান।

ঠিক আছে। অনেক ধন্যবাদ।

আর কিছু–?

না, আর কিছু জানার নেই।

ইয়ে, বিজ্ঞাপন দেখে বুঝতে পারিনি এটা আপনার বাড়ি।

সেটা না বোঝারই কথা।

আপনাকে মিট করে খুব ইয়ে হলাম।

ঝাড়া পাঁচ ঘণ্টা তার ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থেকে বিকেলে চা খেতে বেরিয়ে এসে ফেলুদা হাজরাকে একটা টেলিফোন করল:

কাল সকালে কী করছেন?

কেন বলুন তো?

হালদার বাড়িতে আসতে পারবেন।–নটা নাগাদ? মনে হচ্ছে রহস্যের কিনারা হয়েছে। তৈরি হয়ে আসবেন।

লালমোহনবাবুকে টেলিফোনে বলে দেওয়া হল, আমরা ট্যাক্সি করে চলে যাব তাঁর বাড়ি সাড়ে আটটায়। সেখান থেকে তাঁর গাড়িতে বারাসত।

রহস্য আরও বৃদ্ধি পেল নাকি?

না। সম্পূর্ণ উদঘাটিত।

সব শেষে অমিতাভবাবুকে ফোন করা হল।

আপনাদের বাড়িতে কাল সকালে একটা ছোটখাটো মিটিং করব ভাবছি।

মিটিং?

আপনাদের পুরুষ মেম্বার যে কজন আছেন তাঁরা যেন থাকেন। আর হাজরাকে থাকতে বলেছি।

নটায় হাজিরা। আপনার কাজের হয়তো একটু দেরি হতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা জরুরি।

অমিতাভবাবু রাজি হয়ে গেলেন। —পুরুষ মেম্বার মানে কি অনুকেও চাইছেন?

না। সে না থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। এটা শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য।

আমরা যখন পৌঁছলাম, তার আগেই হাজরার দল হাজির। ফেলুদা এ রকম ধরনের মিটিং এর আগেও করেছে। প্রত্যেক বারই আমার মনের মধ্যে একটা চনমনে ভাব, কারণ জানি না। কী হতে চলেছে, কার ভাগ্যে হাতকড়া আছে, কীভাবে ফেলুদা রহস্যের সমাধান করেছে। লালমোহনবাবু আমাকে বললেন, আমি চিন্তাটাকে স্রেফ অন্য পথে ঘুরিয়ে নিয়েছি। এ ব্যাপারে ব্রেন খাটিয়ে কোনও লাভ নেই, কারণ আমার ঘিলুতে অনেক ভেজাল, তোমার দাদারটা পিওর। নিজের তৈরি রহস্যের সমাধান এক জিনিস, আর অ্যাকচুয়েল লাইফে সমাধান আরেক জিনিস।

নীচের বৈঠকখানা ঘরে জমায়েত হয়েছি। হৃষীকেশবাবুর দিল্লি যাবার সময় হয়ে এসেছে। বললেন, এ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচি মশাই! কাগজ থাকলে তরু একটা কথা। এখন প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

অচিন্তবাবুর সঙ্গে ভাল করে আলাপ হয়নি। তিনি আপত্তি করেছিলেন এই মিটিং-এ উপস্থিত থাকার ব্যাপারে। তাঁর নাকি একটা বড় পার্ট নিয়ে খুব পরিশ্রম করতে হচ্ছে। কালই নাকি নাটকটার প্রথম শো। ভদ্রলোক ফেলুদাকে বললেন, আপনার এ ব্যাপারটা কতক্ষণ চলবে?

ফেলুদা বলল, খুব বেশি তো আধা ঘণ্টা।

ভদ্রলোক তাও গজগজ করতে লাগলেন।

কফি খাবার পর ফেলুদা উঠে দাঁড়াল। কালশিটে ঢাকার জন্য ও আজ কালো চশমা। পরেছে। এটা ওর একেবারে নতুন চেহারা। হাত দুটোকে প্যান্টের পকেটে পুরে সে আরম্ভ করলে তার কথা।

পার্ব্বতীচরণের খুনের ব্যাপারে। আমাদের যেটা সবচেয়ে অবাক করেছিল সেটা হল সাধন দস্তিদারের অন্তধন। দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে খুনটা হয়। সাধন দস্তিদার পার্বতীবাবুর ঘরে ছিলেন সোয়া দশটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত। সাড়ে দশটায় তাঁকে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে যেতে দেখেছি; দশটা পঁয়ত্রিশে অনিরুদ্ধর সঙ্গে কথা বলে পার্বতীবাবুর ঘরে গিয়ে আমরা তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখি। তৎক্ষণাৎ সাধন দস্তিদারকে খোঁজা হয়, কিন্তু পাওয়া যায় না; দারোয়ান বলে, তাঁকে গেট থেকে বেরোতে দেখেনি। বাগানে খোঁজা হয়, সেখানেও পাওয়া যায়নি। কম্পাউন্ডের যে পাঁচিল, সেটা আট ফুট উঁচু। সেটা টপকানো সহজ নয়, বিশেষ করে হাতে একটা ব্রিফকেস থাকলে। আমরা–

এখানে অচিন্ত্যবাবু ফেলুদাকে বাধা দিলেন।

সাধনবাবুর আগে যিনি এসেছিলেন, তাকে কি আপনি বাদ দিচ্ছেন? আপনার বাবাকে যেভাবে আঘাত করা হয়েছিল, সেটা শক্ত সমর্থ লোকের পক্ষেই সম্ভব। পেস্টনজীর আকঞ্জাইটিস আছে, তিনি ডান হাত কাঁধের উপর তুলতে পারেন না। অবিশ্যি পেস্টনজী ছাড়াও একজন তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন যিনি পেস্টনজী ও সাধনবাবুর ফাঁকে পার্ব্বতীবাবুর ঘরে গিয়ে থাকতে পারেন।

তিনি কে?

আপনি।

অচিন্ত্যবাবু সোফা ছেড়ে উঠে পড়েছেন।

আ-আপনার কি ধারণা আমি।–?

আমি শুধু বলেছি আপনার সুযোগ ছিল। আপনি খুন করেছেন সে কথা তো বলিনি।

তাও ভাল।

যাই হাক–সাধনবাবুর অন্তর্ধান বিশ্বাসযোগ্য হয় এক যদি দারোয়ান ভুল বা মিথ্যে বলে থাকে। আর দুই, যদি সাধনবাবু এ বাড়ি থেকে না বেরিয়ে থাকেন।

কোনও চারা কুঠুরিতে আত্মগোপন করার কথা বলছেন? হৃষীকেশবাবু প্রশ্ন করলেন।

অমিতাভবাবু বললেন, সে রকম লুকোনোর কোনও জায়গা এ বাড়িতে নেই। একতলার অধিকাংশ ঘরই তালাচাবি বন্ধ। এক বৈঠকখানা খোলা, রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর খোলা আর হৃষীকেশবাবুর ঘর খোলা।

এবং সে ঘরে তাকে আমি আশ্রয় দিইনি। সেটা আমি বলতে পারি, বললেন। হৃষীকেশবাবু। শুধু তাই নয়, সাধনবাবু যখন আসেন, তখন আমি ছিলাম না।

আমরা পোস্টাপিসে খোঁজ নিয়েছি, বলল ফেলুদা।আপনি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন পোস্টাপিস খোলার সঙ্গে সঙ্গে। তখন দশটা। পাঁচ মিনিট লেগেছে। আপনার টেলিগ্রাম করতে। তারপরেই আপনি–

তারপর আমি যাই ঘড়ির ব্যান্ড কিনতে।

দুঃখের বিষয় দোকানের লোক আপনাকে মনে করতে পারছে না।

মিঃ মিত্তির, দোকানের লোকের স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করেই কি আপনি গোয়েন্দাগিরি করেন?

না, তা করি না। এবং তাদের কথায় আমরা খুব আমল দিইনি। আর আপনিও যে সত্যি কথা বলছেন সেটা আমরা মানতে বাধ্য। নই।

কেন, আমি মিথ্যে বলব কেন?

কারণ সোয়া দশটার সময় আপনারও তো পার্বতীচরণের ঘরে যাবার প্রয়োজন হয়ে থাকতে পারে!

এ সব কী বলছেন। আপনি? আপনি নিজেই বলছেন। সাধনবাবুকে বেরোতে দেখেছেন, আবার বলছেন আমি গিয়েছি?

ধরুন সাধন দস্তিদার যদি নাই এসে থাকেন। তার জায়গায় আপনি গেলেন।

আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। ঘরে সবাই চুপ, তারই মধ্যে হৃষীকেশবাবু হা হা করে হেসে উঠলেন।

মিঃ হালদার কি উন্মাদ না জরাগ্রস্ত, যে আমি দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকব আর তিনি আমাকে চিনবেন না?

কী করে চিনবেন, হৃষীকেশবাবু? আপনি যদি গোঁফ দাড়ি লাগিয়ে চোখের চশমাটা খুলে পোশাক বদলে তাঁর ঘরে ঢোকেন, তা হলে আপনাকে সাত বছর আগের সাধন দস্তিদার বলে। কেন মনে করবেন না পার্বতীবাবু? আপনি আর সাধন দস্তিদার যে আসলে একই লোক! প্রতিশোধ নেবার জন্য চেহারা পালটে নাম পালটে সেই একই লোক যে আবার সেক্রেটারি হয়ে ফিরে এসেছে, সেটা তো আর বোঝেননি পার্বতীচরণ!

হৃষীকেশবাবুর মুখের ভাব একদম পালটে গেছে। তাঁর ঠোঁট নড়ছে, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। দুজন কনস্টেবল এগিয়ে গেল তাঁর দিকে!

ফেলুদার কথা এখনও শেষ হয়নি।

খুনের পর কি আপনার ভাড়া করা কোটের পকেটে পেপার ওয়েট পুরে তার ওজন বাড়িয়ে আপনি পুকুরের জলে ফেলে দেননি? তারপর নিজের ঘরে গিয়ে আবার হৃষীকেশ দত্ত সেজে বেরিয়ে আসেননি?

এই শীতকালেও হৃষীকেশবাবুর শার্টের কলার ভিজে গেছে।

আরও একটা কথা, বলে চলল ফেলুদা। সাধু সাবধান কথাটা কি চেনা চেনা লাগছে? অনিরুদ্ধের জন্য কেনা চন্দনার মুখে কি কথাটা শোনেননি। আপনি সম্প্রতি? আর শুনে আপনার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে কি বিশ্বাস ঢোকেনি যে কথাটা আপনাকে উদ্দেশ করেই বলছে? আপনি সাধু সেজে মনিবের সর্বনাশ করতে যাচ্ছেন জেনেই পাখি এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করছে? আপনিই কি এই পাখিকে খাঁচা থেকে বার করে বাগানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেননি? এবং এই কাজটা করার সময় আপনাকেই কি পাখি জখম করেনি?

হৃষীকেশবাবু এবার লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে।

অ্যাবসার্ড! অ্যাবসার্তা! কোথায় জখম করেছে? কোথায়?

ইনস্পেক্টর হাজরা, আপনার লোককে বলুন তো ওঁর ডান হাত থেকে ঘড়িটা খুলে নিতে।

প্রচণ্ড বাধা সত্ত্বেও ঘড়ি খুলে এল।

কবজিতে প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা একটা আঁচড়ের দাগ, সেটা দিব্যি ঘড়ির ব্যান্ডের তলায় লুকিয়ে ছিল।

আমি খুন করতে যাইনি–দোহাই আপনার–বিশ্বাস করুন!

হৃষীকেশবাবুর অবস্থা শোচনীয়।

সেটা অবিশ্বাস্য নয়, বলল ফেলুদা, কারণ আপনার আসল উদ্দেশ্য ছিল নেপোলিয়নের চিঠিটা নেওয়া। পেস্টনজী বড় রকম দর দিয়েছেন সেটা আপনি জানতেন। মিঃ হালদার বেচাবেন না সেটাও আপনি পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন। কিন্তু জিনিসটা চুরি করে তো পেস্টনজীর কাছে বিক্রি করা যায়! তাই—

আমি না, আমি না? মরিয়া হয়ে প্রতিবাদ জানালেন হৃষীকেশবাবু।

আগে আমার কথা শেষ করতে দিন। ফেলুমিত্তির আধাখেচড়াভাবে সমস্যার সমাধান করে না। এ ব্যাপারে আপনি এক নন, সেটা আমি জানি। চিঠিটা বার করে এনে নিজের ঘরে গিয়ে মেক-আপ বদলে আপনি যান আরেকজনের কাছে চিঠিটা দিতে। কিন্তু বাড়িতে খুন হয়েছে, খানাতল্লাশি হবে, সেটা জেনে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিও সাময়িকভাবে চিঠিটাকে অন্য জায়গায় চালান দেন। তাই নয়, অচিন্ত্যবাবু?

প্রশ্নটা একেবারে বুলেটের মতো। কিন্তু লোকটার আশ্চর্য নার্ভ। অচিন্তবাবু ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে দিব্যি বসে আছেন সোফায়।

বলুন, বলুন, কী বলবেন, বললেন ভদ্রলোক, আপনি তো দেখছি সবই জেনে বসে আছেন।

আপনি সাড়ে দশটার একটু পরে একবার আপনার ভাইপোর ঘরে যাননি?

গিয়েছিলাম বইকী। আমার ভাইপোর ঘরে যাওয়ায় তো কোনও বাধা নেই। সে ক'দিন থেকেই বলছে তার নতুন খেলনা দেখাবে, তাই গিয়েছিলাম।

আপনার ভাইপোর ঘরে গতকাল এবং তার আগের রাত্রে একজন চোর ঢুকেছিল। সে যা খুঁজছিল তা পায়নি। আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে, সে চার আপনিই এবং আপনি খুঁজতে গিয়েছিলেন নেপোলিয়নের চিঠি-যেটা আপনিই তার ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলেন? চিঠিটা পাবেন। এই বিশ্বাসে আপনিই পেস্টনজীকে ফোন করে আফার দিয়েছিলেন, তারপর সেটা না পেয়ে আর পেস্টনজীর ওখানে যেতে পারেননি?

আমিই যখন লুকিয়েছিলাম, তখন সেটা আমি কেন পাব না সেটা বলতে পারেন?

কারণ যাতে লুকিয়েছিলেন, সেটা ছিল খোকার বালিশের তলায়। এই যে।

ফেলুদা মিঃ হাজরার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। হবি সেন্টার থেকে কেনা লাল প্লাস্টিকের মেশিনগান চলে এল ফেলুদার হাতে। তার নলের ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে টান দিতে বেরিয়ে এল গোল করে পাকানো নেপোলিয়নের চিঠি।

হৃষীকেশবাবুর মেক-আপের ব্যাপারে আপনিই মালমশলা সাপ্লাই করেছিলেন বোধহয়? প্রশ্ন করল ফেলুদা,ভাগ বাঁটায়ারা কী রকম হত? ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি?

*

মালীর ছেলে শঙ্কর চন্দনাটা ধরতে পেরেছিল ঠিকই, যদিও পাখি ফেরত পাওয়ার পুরো ক্রেডিটটা তার খুদে মক্কেলের কাছে ফেলুদাই পেল।

অমিতাভবাবু ফেলুদাকে অফার করেছিলেন পার্বতীচরণের কালেকশন থেকে একটা কোনও জিনিস বেছে নিতে। ফেলুদ রাজি হল না। বলল, এই কেসটায় আমার জড়িয়ে পড়াটা একটা আকস্মিক ঘটনা। আসলে আমি এসেছিলাম। আপনার ছেলের ডাকে। তার কাছ থেকে তো আর ফি নেওয়া যায় না?

ঘটনার দু দিন পরে শনিবার সকালে লালমোহনবাবু এসে বললেন, জলের তল পাওয়া যায়, মনের তল পাওয়া দায়। আপনার অতলস্পর্শী চিন্তাশক্তির জন্য আপনাকে একটি অনারারি টাইটেলে ভূষিত করা গেল। —এ বি সি ডি।

এ বি সি ডি?

এশিয়া'জ বেস্ট ক্রাইম ডিটেক্টর।